যুদ্ধশিশু

সালাম আজাদ

যুদ্ধশিশু

বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী সে দেশে চালিয়েছে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন। হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে যে সব বাঙালী মেয়েরা বন্দী ছিলেন, অসহায় সে সব মেয়েদের উপর নরপশুরা চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন। স্বাধীনতার পরে এসব মেয়েরা বেরিয়ে এসেছেন বন্দীশিবির থেকে। কিন্তু নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে যাঁরা গর্ভধারণ করেছেন তাঁদের গর্ভের সে সব সন্তানদের ভবিষ্যৎ কি হয়েছিল?

'যুদ্ধশিশু' গল্পে বাংলাদেশের তরুণ লেখক সালাম আজাদ সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন সে সব শিশুদের কথা। বুশরা যুদ্ধশিশুদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছে এ গল্পে। বইটির অন্যান্য গল্পগুলিতেও বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে লেখকের ক্ষুরধার লেখনীতে।

যুদ্ধশিশু

সালাম আজাদ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪২১

—সত্তর টাকা—

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—সুব্রত মাজী
মুদ্রণ—স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্টিং

JUDDHASISHU
A collection of stories based on
the period of Bangladesh Liberation war
by
Salam Azad
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata 700 073

Price : Rs. 70/-

ISBN : 978-93-5020-139-8

WEBSITE : www.mitraandghosh.co.in
www.golposwalpo.com

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
হইতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ম্যাজিক প্রিন্টার্স, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

এজ্জেহেরা খানম

যিনি অকালে হারিয়ে গেছেন চিরকালের জন্যে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের ৪টি বই

অবৈধ

নোম্যানস ল্যান্ড

অনুপ্রবেশ

দেশভাগের গল্প

সূচিপত্র

যুদ্ধশিশু

নাফিজের কথা

৯ই মার্চ আমি বিয়ে করেছি। ইউনিভার্সিটির পাঠ চুকিয়ে বের হবার মাত্র তিনমাস এগারো দিন আগে নিশাতের সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন সে কেবল আমাদের ডিপার্টমেন্টে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে। মধুর ক্যান্টিন থেকে ছাত্রলীগের একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করবে, সে মিছিলে যোগ দেব বলে সেমিনার রুম থেকে বের হয়ে করিডোর দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একজনের গায়ে ধাক্কা লেগে যায়। 'সরি' বলে তাকিয়ে দেখি একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগেছে। লজ্জা পেলাম, কিছু না বলেই দ্রুত হেঁটে চলে গেলাম। মিছিল আমাকে প্রচণ্ড বেগে টানছিল।

পরদিন একই করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, দেখলাম গতকালের সে মেয়েটি সেমিনারের দেয়াল ঘেঁষে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর হয়তো এখনো কোন বন্ধুবান্ধবী হয়ে ওঠেনি। আর হয়ে থাকলেও তাদের কেউ এখনো এসে পৌঁছয়নি। গতকালের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইবো বলে এগিয়ে গেলাম। সে আমাকে তার দিকে আসতে দেখে দেয়াল থেকে সরে দাঁড়ালো। আর সে ফাঁকে আমি ওর চুল দেখে ফেললাম। ওর এই চুলই আমাকে ওর প্রেমে ফেলেছিল।

রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই একটা ব্যাংকে চাকরি পেয়ে গেলাম। প্রথম মাসের বেতন যেদিন পেলাম, সেদিন নিশাতকে নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ালাম, ঢাকা শহরের প্রায় সর্বত্র। হ্যাঁ, উত্তপ্ত ঢাকা। যত্রতত্র মিছিল মিটিং। সময় পেলেই আমি নিশাতকে নিয়ে মিটিং শুনতে যেতাম।

৭ই মার্চ। দুইদিন পরে আমাদের বিয়ে। নিশাতকে নিয়ে বিয়ের বাজার করলাম দুপুর একটা পর্যন্ত। তারপর আমরা দু'জন গেলাম রেসক্রস ময়দানে। লাখো জনতা এসেছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে।

বিয়ের পরদিন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সিলেট চলে গেলাম নিশাতকে নিয়ে। জাফলং তামাবিলে কাটলো আমাদের ছয়দিন। বলতে পারেন, এই ছয়দিন আমরা হানিমুন করলাম। আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দে, সবচেয়ে বেশি সুখে কেটেছে এই ছয়টি দিন। ঢাকায় ফিরে নিয়মিত অফিস বাসা করছি। নিশাত ক্লাসে যাচ্ছে।

২৫শে মার্চের রাতের ঘটনা আপনারা সবাই জানেন। ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত আমি আফিস করেছি। ২৪ এপ্রিল সকালে নিশাতকে নিয়ে ওর বাবার বাসায় গেলাম। রাতে একটি চিরকুটে আমার মুক্তিযুদ্ধে যাবার কথা লিখে রেখে, নিশাতের নিখাদ ভালবাসার বন্ধন এড়িয়ে দোতলা থেকে পাইপ বেয়ে নীচে নেমে গেলাম। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে কুমিল্লা দিয়ে বর্ডার ক্রস করে ভারতে।

নিশাতের কথা

ভোর রাতে ফজর নামাজের আজানের শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। ঘুমভাঙা চোখে হাত বাড়িয়েছি নাফিজের গলা জড়িয়ে ধরার জন্যে। কিন্তু ওকে নাগালে পাচ্ছিনে। হাত এগোতে এগোতে যখন খাটের বাইরে চলে গেল তখন ভয় পেয়ে বসে পড়লাম। বাথরুমের দিকে তাকিয়ে দেখি দরজা খোলা। দু'বার ওর নাম ধরে ডাকলাম। কোন সাড়া নেই। খাট থেকে নেমে ওকে ডাকতে যাবো, আমার পায়ে এক টুকরা কাগজ বাধলো। ভাঁজ করা কাগজটি খুলে পড়লাম। চিরকুট পড়ে প্রচণ্ড কষ্টে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল, আবার এই বুকভাঙা কষ্টের মধ্যেও গর্বে আমার বুক ভরে উঠলো—নাফিজ মুক্তিযুদ্ধে গেছে এই কথা ভেবে।

আমি কাঁদতে কাঁদতে মার রুমের দরজায় নক করলাম। মা দরজা খুলে চিরকুট পড়ে নিজেও কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।

বাবা কাঁদলেন না, কিন্তু তাঁর মুখে চিন্তার ছাপ দেখলাম।

আমি বাবার একমাত্র সন্তান। পাড়ায় সুন্দরী মেয়ে হিসেবে আমার পরিচিতি আছে। আমি যখন ক্লাস নাইনে উঠি তখন থেকেই মা আমাকে শরীর ঢেকে রাখার, চলাফেরার অনেক রকম তালিম দেওয়া শুরু করেছিলেন। পাড়ার যে সব ছেলেরা আমার খেলার সাথী ছিল, মা ওদের সঙ্গেও আগের মতো মিশতে দিতেন না। পাড়ার বখাটে ছেলেরা মোড়ের পানের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকত। আমরা স্কুল-কলেজে যাবার পথে ওরা আপত্তিকর উক্তি করত।

কিন্তু বিশু নামের পাড়ার বখাটে ছেলেটিকে আমি কোনদিন মোড়ের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি। এ কারণে বিশুকে অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে আলাদা মনে হত, কিছুটা ভালো লাগতো।

একদিন এই বিশুকে দেখলাম আমাদের পাড়ায় একটা পাকিস্তানী সেনাকে ধরে নিয়ে এসেছে। ওদের ক্লাবে নিয়ে সেই হানাদারটিকে হত্যা করলো। চারদিকে বিশুর নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। কিন্তু আমি শঙ্কিত হলাম। আর আমার এই শঙ্কা মূল্যহীন হলো না। রাতেই একটি জীপ আর তিনটি ট্রাক ঢুকলো আমাদের পাড়ায়। নির্বিচারে গুলি চালালো ওরা। বিশুকে ক্লাবেই ধরে ফেললো। ওর দু'হাত বেঁধে জীপের পিছনে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো।

আমি তেতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলাম। হঠাৎ একটি পাকিস্তানী সেনার চোখে চোখ পড়ে গেল। আমি বারান্দা থেকে ঘরে চলে এলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। বাবা দরজা খুলে দাঁড়ালেন। বাবাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে ওরা তিনজন ঘরে ঢুকে গেল। আমি ভয়ে মাকে জড়িয়ে

ধরলাম। কিন্তু মার বাঁধন থেকে নেকড়ের দল আমাকে ছিনিয়ে নিল।

বাবা বাধা দিতে গেলে বাবা মাকে ওরা একসঙ্গে বেঁধে ফেললো।

আমি মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী জানি না কে যেন ওদের এই খবরটি জানিয়ে দিয়েছে। আমাকে বিবস্ত্র করার সময় ওরা বার বার সে কথা বলছিল। আমার প্রচণ্ড চিৎকার উপেক্ষা করে ওরা পর্যায়ক্রমে তিনজন আমাকে বাবা-মার সামনে ধর্ষণ করলো।

আমাকে কাপড় পড়ার হুকুম দিয়ে একজন আমার মার বাঁধন খুলে দিল। অপর দু'জন মার দু'হাত দু'পা ধরে আমাদের তিনতলা থেকে ছুঁড়ে মারলো রাস্তায়। এই দৃশ্য দেখে বাবা জ্ঞান হারালেন।

ওরা আমাকে টেনে হেঁচড়ে জীপে নিয়ে তুললো। যাবার সময় বাবার অজ্ঞান দেহটিতে পর পর তিনটি গুলি করলো। বাবা-মার জন্য আমার বিলাপ জীপের শব্দে মিলিয়ে গেল। জীপ কিছুটা পথ যেতেই পিছনে চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি বিশুর দেহটি কংক্রিটের রাস্তার উপরে হেঁচড়ে জীপের সমান গতিতে এগিয়ে আসছে। জীপ যখন নির্ধারিত স্থানে এসে থামলো, তখন বিশুর ছিন্ন ভিন্ন শরীরটা যদিও আছে, কিন্তু শরীরের সঙ্গে মাথার চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

নাফিজের কথা

ট্রেনিং শেষে আমাকে বরিশাল এলাকায় যুদ্ধ করতে পাঠালেন কর্তৃপক্ষ। বরিশাল আমার নিজের এলাকা কিন্তু আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল ঢাকা বা এর আশেপাশে যুদ্ধ করা, ঢাকায় আমার যুদ্ধক্ষেত্র হলে ক্ষণিকের জন্য নিশাতের সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনা ছিল। এই বলে আমি বরিশালকে মেনে নিলাম, সবকিছুর চেয়ে এখন আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধ বড়। এমনকি নিশাতের ভালবাসার

থেকেও।

বরিশালের পর পর দুটি যুদ্ধেই আমরা জয়ী হলাম। এই যুদ্ধ দুটিতে আমরা আঠারজন হানাদার খতম করলাম। আমাদের মধ্যে হাবিব ছিল হানাদার হত্যায় প্রচণ্ড রকম কৌশলী। একদিন সে টুকরিতে করে ডাব নিয়ে যাচ্ছিল হানাদার ক্যাম্পের কাছ দিয়ে। ঐ ডাবের প্রত্যেকটিতে সিরিঞ্জ দিয়ে বিষ ঢুকিয়ে রেখেছিল। হানাদাররা ওর টুকরি নামালো কিন্তু ডাব খেলো না। ক্যাম্পের কাছাকাছি যে নারকেল গাছগুলো ছিল তার একটিতে হাবিবকে উঠতে নির্দেশ করলো।

হাবিব ওদের নির্দেশমতো গাছে উঠে ডাব পেড়ে নামতে লাগলো। আর সে সময়ে হাবিবকে লক্ষ্য করে গুলি করলো। ওর দেহটি গাছ থেকে পড়ে মাটিতে দাপাতে লাগলো, দূর থেকে আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি এ দৃশ্য দেখছিলাম। হাবিবের লাসটিও ওরা ফেরত দেয়নি। পরদিন রাতে আমরা আরো শক্তি বৃদ্ধি করে পাকিস্তান হানাদারদের উক্ত ক্যাম্পটি আক্রমণ করলাম। এই অপারেশনের মাত্র দুই ঘণ্টা আগে নিশাতের বাবার গ্রামের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি পোস্ট করলাম। এর আগে ওদের মগবাজার বাসার ঠিকানায় এগারটি চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। জবাব না পাওয়ায় দুশ্চিন্তা বেড়েছে। আবার সান্ত্বনা পেয়েছি এই ভেবে যে, নিশাতরা হয়তো গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। তাই এবারের চিঠি গ্রামের ঠিকানায় পাঠালাম।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণে আমরা ব্যর্থ হলাম। আমাদের অপারেশন প্ল্যান ওরা আগেই জেনে গিয়েছিল; কি করে জেনেছিল তা অবশ্য জানিনে। আমরা ছয়জন ছাড়া দলের সবাই হানাদারদের হাতে শহীদ হলো, আমরা ছয়জন পালিয়ে একটা মাদ্রাসায় আশ্রয় নিলাম।

গভীর রাতে এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা জনৈক মাওলানা হানাদারদের হাতে আমাদের ছয়জনকে তুলে দেয়। আমরা অবগত

ছিলাম না, এটা হানাদারদের দোসরের মাদ্রাসা ছিল। ওরা আমাদের কাছাকাছি একটি ইটের ভাটায় নিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড় করালো, আমাদের সামনে পিছনে দুইটি হানাদার স্টেনগান নিয়ে দাঁড়াল। আমি শত সহস্রবার আল্লাহকে ডাকছিলাম। একবার শুধু শুনতে পেলাম ফায়ার। এরপর আমার সর্বাঙ্গে কতগুলি সিসা ঢুকেছিল তা বলতে পারব না।

নিশাতের কথা

সেনা ছাউনীর একটি বিশেষ ঘরে আমাকে রাখা হলো। এই ঘরে আমার মতো আরো ক'জন মেয়ে আছে। প্রথমে আমি থমকে গেলাম বীণা নামের একটি মেয়েকে দেখে। ওকে পুরানো ঢাকার হিন্দুপ্রধান এলাকা থেকে পশুরা এখানে এনেছে।

ওদের তিনতলা বাসার সরু সিঁড়ি দিয়ে টেনে নামানোর সময় সে একটা পিলার জাপটে ধরেছিল আত্মরক্ষার্থে। কিন্তু হায়! হানাদাররা তখন ওর হাত ছেড়ে চুল টেনে নামাতে চাইল। বীণার প্রচণ্ড চিৎকারে বাতাস ভারী করেছিল বটে, কিন্তু হানাদারদের মন গলেনি। ওদের পশু-হাতের টানে বীণার চুলের সঙ্গে মাথার চামড়ার আংশিক উঠে এসেছিল। এরপরও পশুর দল বীণাকে রেহাই দেয়নি। গতকাল এই অবস্থায় ক্যাম্পে এনে ওরা বীণাকে ধর্ষণ করেছে। বীণা এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে।

পারুলকে ধর্ষণ করলো কিছুক্ষণ আগে এক হানাদার। ধর্ষণের পর পারুলের বাম স্তনটি কেটে নিলো একটি ছুরি দিয়ে। নীচের ঠোঁট কাটলো, ডান গালের আংশিক মাংস কাটলো। তারপর সিগারেটের আগুন চেপে ধরলো পারুলের যোনিপথে। পারুলের চিৎকারে আকাশ কেঁপে উঠলো, বাতাস ভারী হয়ে গেল আর হানাদারটি পারুলের কর্তিত স্তনটি নিজের মুখের কাছে নিয়ে

বিকট হাসিতে ফেটে পড়লো। ওর হাসিতে আমি কানে হাত চাপা দিলাম।

পরদিন রাহেলা নামের যে মেয়েটিকে ক্যাম্পে আনলো, তার বয়স ষোল কি সতের হবে। রাহেলা কি এখনো বেঁচে আছে? ওকে প্রতিদিন কয়েকজন হানাদার উপর্যুপরি ধর্ষণ করত। প্রায় প্রতিদিন ওদের কেউ না কেউ রাহেলার শরীরে একটা করে চিহ্ন আঁকত। কেউ দাঁতে কামড় দিয়ে ওর শরীরের যে কোন অংশের মাংস তুলে নিত। কেউ ধারালো ব্লেড দিয়ে শরীরে চিহ্ন আঁকত। এসব আঘাতের যন্ত্রণায় সে যখন চিৎকার করত তখন ওরা রাহেলার ক্ষতস্থানগুলোতে লবণ ছিটিয়ে দিত।

এই জাতীয় কোন অত্যাচার আমার শরীরে হয়নি। তবে প্রতিদিন আমাকে ধর্ষণ করত একটি বিশেষ হানাদার। শুধু একদিন একটি বাঙালি উক্ত হানাদারের সঙ্গে আমাকে ধর্ষণ করে। সেই বাঙালি পশুকে এখনও আমি এই স্বাধীনদেশের মাটিতে জৌলুসের সঙ্গে বসবাস করতে দেখি। এই বাঙালি যেদিন আমাকে ধর্ষণ করে তখন আমি পাঁচ মাসের প্রেগনেন্ট। আমার এই গর্ভধারণ আস্তে আস্তে আমাকে ওদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিল। যে সব সিপাহী আমাদের পাহারা দিত ওরা আমার দিকে বিশেষ নজর রাখত।

হঠাৎ একদিন দেখলাম আমাদের পাহারায় কেউ নেই। অসংখ্য বিধ্বস্ত মেয়ে ক্যাম্প থেকে আস্তে আস্তে বের হতে লাগলো। তাদের সঙ্গে আমিও নিজের শরীর টেনে বের করলাম। কারো কারো কাছে শুনলাম দেশ স্বাধীন হয়েছে। নাফিজের কাছে ফিরে যাচ্ছি এই ভেবে সব ভুলে গেলাম। নাফিজ যুদ্ধ শেষে ফিরে এসেছে। সে আমাকে নিতে আসবে।

কিন্তু নাফিজ এলো না। আমি সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে আমাদের মগবাজারের বাসায় এলাম। দেখলাম বাসায় যারা আছে তাদের কেউ আমাদের আত্মীয় নয়, স্বজন নয়। ওরা আমাকে

আমাদের বাসায় ঢুকতে দিলো না।

আমি তিনদিন একরকম নিরন্ন অবস্থায় বাসার গেটে বসে থাকলাম। নাফিজ যদি আসে সে আশায়। কিন্তু সে এলো না। এই তিনদিন আমি আমাদের পাড়ার অনেকের কাছ থেকে অসহ্যকর কটূক্তি শুনেছি। কেউ আমাকে সহানুভূতি দেখায়নি, করুণা করেনি। দয়াও না।

এক সময় আমি জ্ঞান হারালাম, তারপর কিভাবে আমি হাসপাতালে এলাম বলতে পারবো না। আমার বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত আমি এই হাসপাতালেই ছিলাম। আমার ডেলিভারির পরে আমার বাচ্চাটিকে পর্যন্ত ওরা আমার দেখতে দেয়নি।

আর নাফিজ? সে কোথায় আছে, কেমন আছে আজও জানিনে। তবে আমি ওর জন্য অপেক্ষা করে আছি এবং সারাটি জীবন তাই থাকবো।

এখন আমি একটি বিদেশী সংস্থায় চাকুরি করি। ডেসপারেট মহিলাদের পুনর্বাসিত করা এই সংস্থার কাজ। আমাদের মগবাজারের বাড়িটি বেদখল। একজন স্বাধীনতাবিরোধী বাড়িটিকে নিজের প্রাসাদ বানিয়েছে।

বুশরার কথা

আমি বুশরা। স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী। আমার বাবা মা ব্রিটিশ ক্যাথলিক। তাদের নিজের কোন সন্তান নেই। আমার জন্ম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি হাসপাতালে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭২। আমার জন্মের পর আমি বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে যাই। সরকার আমাকে এই নিঃসন্তান ব্রিটিশ দম্পতির কাছে দত্তক দিয়ে দেন।

১৯৯২ সালে আমি বাবা-মার সঙ্গে একবার ঢাকা গিয়েছিলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছা ঢাকা যাবার। কিন্তু এখন আর সেখানে আমি যেতে চাইনে। ঢাকার প্রতি মুহূর্ত এখন আমার কাছে বিষাদে ভরা। অথচ ঢাকা যাবার আগে আমি কত স্বপ্ন দেখতাম, ঢাকায় আমার মা আছেন, যাঁর গর্ভে আমার জন্ম। যে সংস্থা এই ব্রিটিশ দম্পতির নিকট আমাকে দত্তক দিয়েছিল, ঢাকা গিয়ে সেই সংস্থা খুঁজে বের করতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। সব কষ্টকে আমি তুচ্ছ ভেবেছি। আমার মাকে খুঁজে পাবো এই আশায়।

সংস্থাটিতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পাই। তিনি এখানে কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করেন। ভদ্রলোক আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা দিয়েছেন। কিন্তু আমার কোন উপকার হয়নি।

পুরানো রেকর্ড ঘেঁটে একজন মহিলা আমার নামটি খুঁজে পেলেন। জন্ম-তারিখও পেলেন। আমার ব্রিটিশ বাবা মা যে তারিখে আমাকে দত্তক নিয়েছেন সেই তারিখটিও খাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার মার কোন ঠিকানা লেখা নেই। এমনকি নামটি পর্যন্ত না। সে স্থানে শুধু লেখা আছে ‘অজানা’।

এই অজানা শব্দটি সারা জীবন আমায় তাড়িত করবে। আমার মার কথা, জন্মের কথা, অতীতের কথা এই একটি অজানা শব্দের গভীর গহ্বরে তলিয়ে গেছে। আমার একজন ভারতীয় সহপাঠীর

নিকট 'মা' শব্দটি বাঙলায় শিখেছিলাম। আমার জানা এই একটি মাত্র বাঙলা শব্দ সারা জীবনে আমি আর ব্যবহার করতে পারব না।

উপসংহার

নিশাত যে সংস্থাটিতে চাকরি করে সেখানে বুশরা গিয়েছিল তার মার সন্ধানে। আর বুশরাকে পুরানো রেকর্ড ঘেঁটে নিশাতই দেখিয়েছিল তার মা অজ্ঞাত। নিশাতের অন্তরের গভীরে একবারও কি বলেনি এই বুশরাই তার গর্ভজাত সন্তান?

কেউ জানে না যাদের কথা

কে জানত এমনভাবে আটকা পড়ব? তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম দেশে গিয়ে আবার কখনও সবার সঙ্গে মিলতে পারব? আম্মা ও আমি খালার বাড়িতে গিয়েছিলাম। যশোর জেলার কালিয়া থানার জামরীভাঙ্গায় খালাম্মার বাড়ি। আব্বা আমাদের রেখেই দেশে ফিরে আসেন, কথা ছিল আমরা দু'মাস থাকব। পরে আব্বা গিয়ে নিয়ে আসবেন।

একাত্তরের ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে আমরা যাই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশটা যদিও তখন একটু ঘোলাটে তবু পঁচিশের ঘটনা কেউ আশা করেনি।

পঁচিশে মার্চ-এর পরই আম্মার মনে উদ্বেগ লক্ষ্য করি। সমস্ত রকম যোগাযোগ যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন বিক্রমপুরে ফিরে আসার কথা আর ভাবতে পারলাম না। আব্বার কোন খবরই নেই। যশোরের এই অঞ্চলটা হিন্দু বসতিপূর্ণ। খালাম্মাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে রামনগর। যশোরের পূর্বসীমা। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে চিত্রা ও আত্রাই। খালাতভাই রফিকের এক হিন্দু বন্ধুর বাড়ি এই গ্রামে। বুদ্ধদেব বিশ্বাস বি.এ., বি.এড.। জয়ারাবাদ গামিলনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বাবা, মা, স্ত্রী ও বাসুকে নিয়ে ছোট সংসার। এসব পরিচয় রফিক ভাই-এর কাছে থেকেই আমি জানতে পেরেছিলাম।

এপ্রিলের মাঝামাঝির ঘটনা। আত্রাই থেকে মুজতআলির খালটা ফুলতলার ভাঁটিতে ভৈরবের সঙ্গে মিশে যশোর খুলনার সীমা নির্দেশ করছে। রামনগর, আমতলা, জয়ারাবাদ, তারও দক্ষিণে সিদ্ধিপাশা ও আরও কয়েকটি গ্রাম বর্ধিষ্ণু হিন্দুর বাস। মুজত-আলির পূর্ব তীর দিয়ে আড়ুয়া, লক্ষ্মীকাটি প্রতাপ, সেনহাটি আরও অনেক গ্রাম। এখানেও অধিবাসীদের অধিকাংশ হিন্দু। প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দুবাড়িতে অগ্নিসংযোগ লুটপাট শুরু হলো। বিশেষত আওয়ামী লীগার রূপে চিহ্নিতদের বাড়িতেই এসব

সংগঠিত হতে থাকে। ১০ই এপ্রিল নড়াইল মহকুমার এস ডি ও সাহেবের বাংলোর পাশেই দুটো বোমারু বিমান বোমা নিক্ষেপ করে যায়। যার শিকার হয় এক নিরীহ দোকানদার। কয়েকজন হয় আহত। এরপরই সিদ্ধিপাশা অঞ্চল থেকে ক্রমে উত্তর দিকে নদীর কূল বরাবর লুটপাটের একটা হিড়িক পড়ে যায়। দিনের বেলায় চারদিক থেকে কালো ধোঁয়া আকাশে উঠে। রাত্রে আগুনের লেলিহান শিখা লিকলিক করতে থাকে। মানুষের আর্ত চিৎকার, বাঁশের ঠুশঠাশ শব্দ এক ভয়াল পরিবেশ তৈরি করে।

খুলনা দৌলতপুরের বিহারীরা তৎকালীন সরকার-পুষ্ট হয়ে কতিপয় স্থানীয় অসাধু লোকের সহায়তায় এসব কাজে তৎপর ছিল। স্থানীয় ভাবেই এদের মোকাবিলা করছিল মিলিত গ্রাম্য হিন্দু মুসলমান। বুদ্ধদেববাবুও এই দলে ছিলেন। ২০শে এপ্রিলের দিকে লুটেরা দল বার কয়েক হানা দিয়েও যখন কৃতকার্য হতে পারলো না, তখন সাময়িক ভাবে কিছুটা দমকা হাওয়ার মতো থমথমে ভাব থাকলেও পরবর্তী কালে যে মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে একথা কারও অবিদিত ছিল না। রফিক ভাইদের বাড়ি সেদিন বুদ্ধদেববাবু বাবা, মা ও স্ত্রীপুত্রসহ এসেছিলেন। বাবা বুড়োমানুষ। অসুস্থ। নৌকা করে এসেছিলেন। ঘাট থেকে, আমরাই তাকে ধরাধরি করে নামাই। বুদ্ধদেববাবু রফিক ভাইয়ের হাত ধরে বললেন, রফিক, বাবাকে দেখিস, ওরা রইল। শয়তানরা দু'বার হানা দিয়ে গেছে, ওদের বিশ্বাস নেই। আবারও আসতে পারে। আমি আসি।

বুদ্ধদেববাবু চলে গেলেন। কারও মুখে কোন কথা নেই।

বুদ্ধদেববাবুকে আর একবার দেখেছিলাম সেই বাড়িতে রাত বারোটায়, আর দেখিনি, তাঁর বাবার জ্বর ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল, পাশে দু'তিনজন কোয়াক ডাক্তার ছিলেন। তাঁদের ডাকা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এগারোটার দিকে তিনি দেহ রাখলেন। যদিও পরিচর্যার অন্ত ছিল না তবুও শেষ রক্ষা হল না।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবে শয়তানদের আবির্ভাব ঘটল। নদীপথে গানবোটে এসে দু-তীরের বাড়িগুলো টমিগানের সাহায্যে আগুন ধরিয়ে দিল। মুহূর্তে অগ্নিশিখা দিগ্বলয় গ্রাস করে ফেলল। ঘর-বাড়ি, গরু-বাছুর সোনা দানা সবকিছু ফেলে ছেলেমেয়ে নিয়ে

মায়েরা মাঠে নেমে গেল। কোথাও কোথাও এক কোমর জল।

আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুটেরার দল বস্তায় ভরে নিচ্ছিল ঘরপোড়া হতভাগ্যদের সঞ্চিত সম্পদরাশি। বিলের ধান জলের মধ্য দিয়ে পলায়নপর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মিলিত আর্ত চিৎকার ও হাজার হাজার গরুকে একহাটু জলে নামিয়ে তাড়া করলে কেমন ঝুপ ঝুপ শব্দ। দুটো মিলে এক বিরাট ভয়াবহতার সৃষ্টি করছিল। খালাম্মাদের এদিকটা ছিল খানিকটা নিরাপদ। আর্ত জনতার উন্মত্ত রব তাই এদিকেই ছুটে আসছিল। শব্দ ক্রমেই রফিক ভাইদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল। আমরা সবাই সমবেত হয়েছিলাম বিলের ধারে। রাত আটটা নটার দিকে তারা বিলের এপারে এল বটে কিন্তু অনেকেই তখন সংজ্ঞা হারিয়েছে। যারা দু'একজন তখনও জ্ঞান হারায়নি, তাদের প্রিয়জন ও প্রিয় বাসস্থান হারাবার বেদনায় আকাশ-বাতাস কান্নায় মুখর করে তুলছে। হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন ভুলে গিয়ে তাদের জল পান করানো, পাখার বাতাস দেওয়া, ফেলে আসা সন্তান সন্ততির খোঁজ করতে সেদিন ভেতর থেকে কে যেন আদেশ দিয়ে বলেছিল এ তোমাদের মানবিক কর্তব্য। খড়রিয়া ও জামরীভাঙ্গার প্রত্যেক বাড়িতে সে রাত্রে ওদের ঠাঁই দেওয়া হয়।

গৃহহারাদের দুর্দশায় সে দিনকার মনের অবস্থা প্রকাশ করা ভাষাতীত। মুমূর্ষুকে ঘরে রেখে রফিক ভাই ও আমি বেশিক্ষণ তাদের সেবা করতে পারিনি। ফিরে আসার পরই বুদ্ধদেববাবুর বাবার মৃত্যু হয়। কোন কথাই তার বলার সাধ্য ছিল না।

বুদ্ধদেববাবু রাত বারোটায় ফিরে এলেন, কিন্তু একা নয়, সঙ্গে আরও তিনজন অচেনা যুবক। প্রত্যেকের কাঁধে রাইফেল, বিকেল বেলা যুদ্ধটা থেমে গেলেও সন্ধ্যার দিকে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে, আর সেই সময়েই বুদ্ধদেববাবুদের সমস্ত এলাকা লালমাটিতে পরিণত হয়। লড়াই তখনও থামেনি। মুক্তিসেনাদের অতর্কিত আক্রমণে প্রথম দিকটা ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও ওদের পাল্টা আক্রমণ ছিল সর্বনাশা।

বুদ্ধদেববাবুর অপেক্ষাতেই তাঁর বাবার মৃতদেহের কোন সৎকার করা হয়নি। বাবার মৃতদেহ দেখে ভেঙে পড়লেন তিনি। কিন্তু আমাদের সবাইকে বিস্মিত করে দিল একটা ঘটনা। মৃত স্বামীর

মাথা কোলে নিয়ে বসেছিলেন বুদ্ধদেববাবুর মা। মৃতের পাশে আমরা সবাই বসে। বুদ্ধদেববাবুকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখে তার মা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমার কান্না সাজে না বাবা। তোমার আগেই আমি চিনেছি তোমার বাবাকে। তোমার অনেক আগেই আমার তার সঙ্গে মেলামেশা; কই আমি তো একফোঁটা চোখের জল ফেলছি না। তুমি কেন কাঁদবে। এখন কান্নার সময় নয়, এই মুহূর্তে ওদের নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় যাও। তাদের সমুচিত শিক্ষা দাও।

যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশও মনে হয় এত কঠোর নয়। সেই রাতের আঁধারে বুদ্ধদেববাবু সঙ্গীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন দ্বিরুক্তি না করে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম সেই মহীয়সী মার মুখের দিকে। না, একটুও শোকতাপের চিহ্ন নেই। বরং বুদ্ধদেববাবুর যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ যেন প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। বাংলাদেশের কোন নারী যে তার একমাত্র পুত্রকে এমন মুহূর্তে দেশের সেবায় ঠেলে দিতে পারে তা আমার জানা ছিল না। বুদ্ধদেববাবু যাওয়ার সময় শুধু রফিকভাইকে বলে গেলেন, রফিক, আমি চললাম, তুমি রইলে, যা হয় কোরো।

সে রাতে রফিকভাই, আমি ও পাড়ার চার পাঁচজন হিন্দু ভদ্রলোক মিলে চিত্রা নদীর তীরে মৃতকে পুঁতে রেখে এলাম। দু'দিন পরে আব্বার সঙ্গে আমরা বিক্রমপুরের দিকে রওনা হই। সেই রাতেই যা বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। জানি না তিনি আজও বেঁচে আছেন কিনা।

এই গল্পটি সত্তর দশকের শেষপ্রান্তে লেখা। আমি তখন স্যার জে. সি. বোস ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। এই বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রী মধুসূদন বিশ্বাস, যিনি আমাকে প্রথম পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বই পড়তে শিখিয়েছিলেন। আমার সেই শিক্ষাগুরু, যিনি এখন পরলোকে; তাঁর নির্দেশে 'সৈয়দ এমদাদ আলী-জগদীশচন্দ্র বসু পুরস্কার' প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্যে এই গল্পটি লিখেছিলাম। শ্রী মধুসূদন বিশ্বাস সেই কাঁচা হাতের লেখনীর উপর নিজের মতো করে কলম চালিয়ে গল্পটি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পরিমার্জিত পরিবর্ধিত এই গল্পটি 'সৈয়দ এমদাদ আলী-জগদীশচন্দ্র বসু পুরস্কার'-এ প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। —লেখক

মৃত্যুর দুয়ার থেকে

কমলাপুর রেল স্টেশনের পশ্চিমদিকে একটি ভাড়া করা জায়গায় গ্যারেজ বানিয়ে বিভিন্ন রকমের গাড়ি মেরামত করে মঈন। এখানে নানা রুচির বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আসে সে। কবি জসীমউদ্দীনের মতো অনেকেই তার বাঁধা খদ্দের। মঈনকে যথেষ্ট স্নেহ করেন কবি। তাঁর নিজের বই এবং প্রায় সব শ্রেণীর বই পড়ার আগ্রহ দেখে নিজের সংগ্রহ থেকে প্রায়ই মঈনকে বই পড়তে দিতেন কবি। অকালে মাতৃবিয়োগের ফলে একাডেমিক পড়াশুনায় খুব একটা এগোতে পারেনি মঈন। কর্মের সন্ধানে ঢাকায় এবং অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে গ্যারেজের স্বত্বাধিকারী হওয়া সম্ভব হয়।

বই পড়া ছাড়া আরও একটি নেশা মঈনকে প্রবলভাবে টানে। এই নেশার টানে সে সংসার, ঘর, ব্যবসা সবকিছু ফেলে ছুটে যায়। হ্যাঁ, নেশাটি আর কিছুই নয়, রাজনীতি।

আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় কর্মী সে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে তার। শেখ মুজিব অনেকের মতো মঈনকে 'তুই' সম্বোধন করেন। সত্তর সালের কথা। কমলাপুরের বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী সভা। মঈন গেল আওয়ামী লীগ অফিসে। শেখ মুজিবের কাছে। বঙ্গবন্ধুকে নিজের ইচ্ছের কথা জানালো। একটা গেটের বাজেট দশ হাজার টাকা। একথা শুনে বঙ্গবন্ধু কিছুটা রাগ করলেন। মঈনকে সরাসরি কিছু না বলে তাঁর কাছে বসা সিরাজুল আলম খানকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দশ হাজার টাকা হলে আমি একজন এম.পি.পাশ করাইয়া আনতে পারি আর ও কিনা একটা গেটেই খরচ করতে চায় দশ হাজার টাকা'।

বঙ্গবন্ধুর কথা শুনে মঈন কিছুটা হতাশ হলো এই জন্য যে, বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে মঈন পাঁচহাজার টাকা আশা

করেছিল। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে সে আশার গুড়ে বালি। বঙ্গবন্ধুর কথা শেষ হবার পর কিছুটা সময় কেটে গেল। তিনি অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সিরাজুল আলম খান উঠে এলেন। মঈনকে এককোনায় ডেকে নিয়ে ছোট একটা চিঠি লিখে দিলেন নয়াবাজারের এক ব্যবসায়ীকে।

সেই চিঠি নিয়ে সদলবলে নয়াবাজার এলো মঈন। ভদ্রলোক চিঠি পড়ে এক মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না। কাঠ এবং গেটের অন্যান্য সরঞ্জাম একটা ট্রাকে ভরে দিলেন এক ঘণ্টার মধ্যে। যার মূল্য কমপক্ষে সাত হাজার টাকা হবে। ঢাকা শহরের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হয়েছিল মঈনদের কমলাপুরের নৌকার তোরণ। এটা নিরপেক্ষ মতামত।

বঙ্গবন্ধু নিজেও মুগ্ধ হয়েছিলেন গেট দেখে। মঈনের পিঠে হাত বুলিয়ে সহাস্য ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মঈন কমলাপুরই ছিল। স্ত্রী সন্তানদের বিক্রমপুরের গ্রামের বাড়িতে রেখে সে গ্যারেজের উত্তরদিকের সফিনা বোর্ডিং-এ রুম নিয়ে নিলো। এখানে থেকেই সে পার্টির লোকজনদের ভালোমন্দ, সুবিধা অসুবিধা দেখে আসছিল। যে কোন সময় সে ভারতে চলে যেতে পারত অথবা আত্মরক্ষার জন্য গ্রামের বাড়িতেই থাকতে পারত। কিন্তু এতগুলো কর্মীকে অসহায়ভাবে কমলাপুরে ফেলে রেখে অন্য কোথাও থাকা তার বিবেকে আঘাত করছিল।

আবাসিক হোটেলের মালিক মঈনকে আন্তরিকভাবে স্নেহ করেন। একদিন সন্ধের পরে হোটেল মালিক মঈনের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনিও এই হোটেলের বোর্ডার। বাড়ি শিয়ালকোটে। পাকিস্তান আর্মির ইন্টালিজেন্সে আছেন। ইকবাল সাহেব। তিনি পাকিস্তান আর্মির একজন কর্নেল। হোটেল মালিক পাকিস্তানপন্থী একথা মঈন জানে। কিন্তু তিনি উগ্র নন। তিনি ইকবালকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, মঈন পাকিস্তানপন্থী এবং তাদের বন্ধু। ভদ্রলোক কেন এমনটি করলেন

তা বুঝতে মঙ্গনের আরও কিছুটা সময় লাগল।

নিজের জীবন এবং হোটেল রক্ষা করার জন্য সে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে মঙ্গনকে এবং পাক আর্মির থেকে ইকবালকে তার হোটেলে রেখেছেন। মঙ্গন-ইকবালের দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য তিনি নিজে থেকে মিথ্যা বলে মঙ্গনের সঙ্গে ইকবালের ঘনিষ্ঠতা করিয়ে দিলেন। এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই মঙ্গন ইকবাল একসঙ্গে বসে চা খায়। বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করে। এই সব আলাপ থেকে পাকিস্তান আর্মির কিছু কিছু গোপন তথ্য কৌশলে মঙ্গন জেনে নেয়। পরে সেগুলো সে মুক্তিযোদ্ধাদের জানায়। হানাদার বাহিনীকে ঘায়েল করতে মুক্তিযোদ্ধাদের সুবিধা হয় মঙ্গনের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে। মঙ্গনের অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে ইকবালকে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরিয়ে দিতে। শুধু এই তথ্যের কথা ভেবে তা করেনি। আরও একটি কারণও এই সঙ্গে জড়িত ছিল।

এখান থেকে ইকবালকে ধরিয়ে দিলে তার জের হিসাবে এই এলাকার নিরীহ মানুষের উপর হানাদার বাহিনী যে অত্যাচার চালাবে তা থেকে রক্ষা করার পুরোপুরি ক্ষমতা মঙ্গনদের ছিল না। আর প্রতিরোধ করতে গেলে অহেতুক রক্তপাত ঘটবে আরো বেশি করে।

হোটেলে ফেরার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই ইকবালের। মাঝে মাঝে আবার সারাদিনই হোটেলে থাকে, বাইরে বেরোলে দেখা যাবে হঠাৎ করে সে এসে উপস্থিত। ইকবাল এভাবে ঘুরে ঘুরে হানাদার বাহিনীর জন্য তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছিল। আর মঙ্গন নিজের গ্যারেজ চালাচ্ছিল। গোপনে স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে দেখা করে তাদের অসুবিধাগুলো দূর করছিল সাধ্যমতো। এভাবেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়গুলি কেটে যাচ্ছিল।

মঙ্গন খাওয়া-দাওয়া করতো হোটেলে। দু'দিন যাবৎ কার্ফু থাকায় সে একরকম না খাওয়া। ইকবালও ফেরেনি এই দু'দিন। মঙ্গনের সঙ্গে আরও চারজন সিলেটি আটকা পড়েছে এই হোটেলে। এরা ঢাকায় কাজে এসেছিল। কার্ফু তাদের আটকে ফেলেছে।

হঠাৎ এক ঘণ্টার জন্য কার্ফু ব্রেক হলে, মঈন সামনের রেস্টুরেন্টের বয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, চাল, ডাল কিছু আছে কিনা।

মঈন দেখলো রেস্টুরেন্টে এই বয়টি ছাড়া আর কেউ নেই।

সে মঈনকে জানালো ময়দা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। ওকে রুটি বানাতে বলে মঈন বাজার করতে যাবে বলে এগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গী চারজনও।

হঠাৎ একটা জীপ এসে থামলো তাদের সামনে। পিছনে আরেকটি ট্রাক।

ট্রাকভর্তি হানাদার বাহিনীর সদস্য। আর ওদের সঙ্গে ক'জন আলবদর আলসামস। রাজাকারদের মধ্য থেকে একজন মঈনের নাম ধরে চিৎকার করে উঠলে মঈন পালানোর উদ্দেশ্যে দৌড় দিতে যাচ্ছিল। জীপের সামনে বসা লোকটি মঈনের দিকে পিস্তল তাক করে ধরে বললো, হ্যান্ডস আপ।

মঈনরা দাঁড়িয়ে গেল।

পিস্তল তাক করা অবস্থায় লোকটি জীপ থেকে নেমে এলো। মঈন লোকটির পোশাকের চিহ্ন দেখে বুঝলো সে পাকিস্তান আর্মির ক্যাপ্টেন। হানাদার সৈন্য আর রাজাকার বাহিনীর লোকরা মঈনদের ঘিরে ফেললো। রাজাকার বাহিনীর ছেলেগুলির অনেকেই মঈনের পরিচিত।

ওরা জোর করে মঈনদের শার্ট প্যান্ট খুলে ফেললো। সেই কাপড় দিয়ে চোখ হাত বাঁধলো। তারপর ক্যাপ্টেন এদেরকে ট্রাকে তুলতে বলল। একজন রাজাকার বলল, এখানেই খতম করে দিই। মিছে এদের ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে গিয়ে ঝামেলা বাড়ানোর কোন অর্থ নেই।

সম্মতি দিয়ে ক্যাপ্টেন জীপে গিয়ে বসলো। ওরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালো মঈনদের। সর্বাগ্রে মঈন। প্রায় উলঙ্গ, চোখ হাত বাঁধা। কমান্ডের স্বরে ক্যাপ্টেন বলল, রেডি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা স্টেনগান মঈনের বুকের কাছে তাক করে

ধরলো একজন হানাদার। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই।

মিলিটারি দেখে অর্ধখোলা দোকানগুলো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মঈনের বুকে দুরু দুরু শব্দ হচ্ছিল। সে ভাবছিল নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের কথা। সৈনিকটি অপেক্ষা করছিল ওপরওয়ালার 'ফায়ার' শব্দটির। ঠিক এই সময় 'স্টপ, স্টপ' বলতে বলতে দৌড়ে এলো ইকবাল।

সে সিপাহীর হাতের স্টেনগানটি ধাক্কা মেরে আকাশের দিকে ঘুরিয়ে দিল। আর ততক্ষণে ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে ফায়ার শব্দটি বের হয়ে গেছে। সৈনিকটির গুলি ফাঁকা আকাশে মিলিয়ে গেল। স্টেনগান ছেড়ে ইকবাল পকেট থেকে কার্ড বের করতে করতে ক্যাপ্টেনকে অকথ্য গালিগালাজ করতে লাগলো।

ক্যাপ্টেন দ্রুত জীপ থেকে নেমে ইকবালকে স্যালুট করলো।

ক্যাপ্টেন রাজাকারদের দেখিয়ে বললো, ওদের ইনফরমেশনে সে এদের হত্যা করতে যাচ্ছিল। এরা নাকি মুক্তি।

মঈনের হাত আর চোখের বাঁধন খুলতে খুলতে ইকবাল বললো, মঈন, মুক্তি ন্যাহি। ম্যারা জানি দোস্ত।

পোকার দখলে মায়ের স্তন

বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকে স্টিমারে চড়ে ফুলছুড়ি ঘাটে যাবার পথে যে চরগুলি দেখা যায়, তার একটি চরে তহুরনের জন্ম। শীতকালে চরগুলি জেগে ওঠে ছোট ছোট টিলার মতো। বর্ষায় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেটুকু টিকে থাকে, তা আবার শীতে জেগে ওঠে মাথা উঁচু করে। ঢেউয়ের আঘাতে ভাঙতে ভাঙতে চরের যে সামান্য অংশ রক্ষা পায়, সমগ্র চরের মানুষ ঐ অবশিষ্টাংশে জড়াজড়ি করে কাটিয়ে দেয় দুর্বিষহ বর্ষাকালটি। এমনি এক দুর্বিষহ বর্ষায় তহুরন তার মার পেটের ভিতর নড়েচড়ে ওঠে পৃথিবীর আলো দেখার প্রত্যাশায়।

জন্মের পরে তহুরন কোনদিন স্কুলে যায়নি। এই চরের কেউই স্কুলে যাবার কথা ভাবেও না। সমস্ত চর জুড়ে হাজার হাজার মানুষ, হাজার হাজার ভোট, কিন্তু কোন ঘরে একখানা বইও খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই। ব্রহ্মপুত্রের অথৈ জল পেরিয়ে ফুলছুড়ি এলে স্কুল দেখা যায়। কিন্তু এই স্কুল চরের ছেলে-মেয়েরা দেখতে পায় না। এই সব বাচ্চাদের বাবা, যারা বাহাদুরাবাদ ঘাটে আসে কুলির কাজ করতে তারা প্রতিদিন দেখে স্কুল।

এগার পূর্ণ হলে তহুরনের বিয়ে হয়ে যায় পাশের চরের আলিমুদ্দিনের সঙ্গে। এই প্রৌঢ় লোকটির ছয়নম্বর বউ হয়ে তহুরন যেদিন ঘরে আসে সেদিন আলিমুদ্দিনের হাঁড়িতে চাউল না থাকায় তহুরনকে সারাদিন না খেয়ে থাকতে হয়েছিল। এভাবে খেয়ে না খেয়ে আলিমুদ্দিনের ঘরে তার সাতটি বছর কেটে গেল। এই সাত বছরে তহুরন তিনটি বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। দেড়মাস পূর্ণ হবার আগেই প্রথম বাচ্চাটি মারা গেছে। কি অসুখে মারা গেছে তা জানে না তহুরন। দ্বিতীয়টি আঁতুড় ঘরেই। প্রথম দুটি বাচ্চা মেয়ে হলেও তৃতীয়টি ছেলে। তহুরনের ছেলের বয়স যখন এগার মাস

আটদিন তখন ব্রহ্মপুত্র ফুঁসে উঠেছে। শুরু হয়েছে নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে তহুরনদের বেঁচে থাকার ভয়াবহ দিন। ঘরের মাচানে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে, বর্ষার তোড় থেকে নিজের ঘর বাঁচানোর জন্যে বিচালি কচুরির স্তূপ বানাচ্ছিল ঘরের চারদিকে। এ-কাজটি তহুরুনকে এ বর্ষায় একাই করতে হচ্ছে। গত বর্ষায় সে আলিমুদ্দিনের সঙ্গে একাজ করেছে। আলিমুদ্দিন যেদিন মারা গেল সেদিন তহুরনের একটুও কান্না পায়নি। বুকের ভিতরে কি যেন দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যাচ্ছিল। চারদিক ফাঁকা আর নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল তহুরনের।

ছাপরা ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে ব্রহ্মপুত্রের স্রোত আঘাত করছিল বেশি করে। সেখানে এক পাঁজা কচুরি ফেলতে গিয়ে তহুরন দেখতে পেল ঘর থেকে একটি বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। কচুরি ফেলে সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলো। মাচানের উপর ঘুমন্ত ছেলেকে নাড়াচাড়া দিল। কিন্তু ঘুম ভাঙলো না বাচ্চার। এক ঝাপটায় ছেলেকে বুকে তুলে নিল তহুরন, তবুও ঘুম ভাঙল না। সাপের বিষাক্ত দাঁতের স্পর্শে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে সে। ওঝা ফকির দিয়ে অনেক চেষ্টা করেও তার শেষ সম্পদের ঘুম ভাঙাতে পারলো না। উঁচু মাটির অভাবে দুই দিন একরাত পরে কলাগাছের ভেলায় ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসিয়ে দিল তহুরণের শেষ আশ্রয়কে।

সব হারিয়ে তহুরন একদিন কাজের সন্ধানে বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকে ট্রেনে চড়লো ঢাকার উদ্দেশে। ঢাকায় নাকি প্রচুর কাজ। ভাতের অভাব নেই। সৌভাগ্যক্রমে সে ট্রেনে এক ভদ্রমহিলার দেখা পেয়ে গেল। পথে তহুরন এই ভদ্রমহিলাকে নিজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলায়, তিনি দয়ার্দ্র হয়ে কমলাপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার সময় তহুরনকে নিজের সঙ্গে নিয়ে নামলেন। ইস্কাটনের একটি দোতলা বাড়ির গেটের সম্মুখে স্কুটার থেকে নেমে তহুরন খালাম্মার পিছু পিছু অনেকটা ভয়ে ভয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলো। ভিতরে প্রবেশ করে তহুরন অভিভূত হয়ে গেল। সে শুনেছে

বেহেস্ত খুব সুন্দর। কিন্তু বেহেস্ত কি এই বাড়ির চেয়েও বেশি সুন্দর? খালাম্মার নির্দেশমতো গোসল সেরে নাস্তা করে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলো তহুরন। বিকেলে একতলা দোতলার সবগুলি ঘর খালাম্মা তাকে ঘুরিয়ে দেখালেন এবং সেই সঙ্গে বলে দিলেন কোন্ ঘরে কে থাকে, কে বসে, তহুরনকে কখন কোন্ ঘরে কি করতে হবে। প্রতিদিন খালাম্মাকে নতুন করে আরও বেশি ভালো লাগতে লাগলো তহুরনের।

একদিন সকালে বড় ভাইজানের ঘরে চা দিতে গেলে, হাত থেকে কাপ নিয়ে তহুরনকে ম্যাচ আনতে পাঠিয়ে বিছানা থেকে উঠে বসলো বড় ভাইজান। দিয়াশলাই এনে বড় ভাইজানের হাতে দিলে, সে ম্যাচ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তহুরনকে জাপটে ধরে বিছানায় ফেলে দিল। অনেক ধস্তাধস্তির পরেও সে যখন তহুরনের চিৎকার থামাতে পারল না, তখন হিংস্র পশুর ন্যায় তহুরনের স্তন কামড়ে ধরলো। তহুরনের চিৎকারের শব্দে খালাম্মা এসে সেদিন বড় ভাইজানের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু বড় ভাইজানের হিংস্র কামড়ে তহুরনের বাম বুকের বোঁটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। খালাম্মা অকথ্য ভাষায় তাকে গালাগালি করলেন। মার গালাগালি গায়ে না মেখে সে বাথরুমে ঢুকে গেল। তহুরন কাঁদতে কাঁদতে খালাম্মার সঙ্গে রান্নাঘরে চলে এলো।

সেদিন থেকে বড়ভাইজানের ঘরে যেতে বারণ করে দিয়েছিলেন খালাম্মা। লজ্জায় সে খালাম্মাকে তার বুকের কথা বলেনি। ব্যথা সহ্যের বাইরে চলে গেলে ঘটনার পঞ্চমদিন সকালের নাস্তা না বানিয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে রান্নাঘরে শুয়েছিল তহুরন।

সকালে রান্নাঘরে এসে খালাম্মা তহুরনের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন সে প্রচণ্ড তাপে পুড়ছে। জ্বরের প্রচণ্ডতা আরও ভালো করে পরখ করার জন্যে তিনি তহুরনের বুক থেকে কাঁথা সরিয়ে হাত দিতে দিয়ে আঁতকে উঠলেন। রক্তে সমস্ত বুক ভিজে গেছে তহুরনের। সাদা ময়লা ব্লাউজ রক্তে লাল হয়ে গেছে। এর কারণ জানতে চাইলেন তিনি। তহুরন ব্লাউজের বোতাম খুলে বাম বুক

বের করে দিল। স্তনটি ফুলে একটি কালো তরমুজের আকার ধারণ করেছে। বোঁটাছিন্ন অংশটি থেকে পুঁজের মতো রস বের হচ্ছে।

খালাম্মা আবার জানতে চাইলেন কেমন করে এই অবস্থা হয়েছে। অতি কষ্টে, লজ্জায় ভয়ে ভয়ে পাঁচ দিন আগের ঘটনার কথা সে খালাম্মাকে স্মরণ করিয়ে দিল। তিনি অগ্নিমূর্তি হয়ে ছুটে গেলেন বড় ছেলের দোতলার ঘরের দিকে। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালেন খালাম্মা। হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করল।

উত্তেজিত বড় ভাইজান সেদিন রাতেই রান্নাঘরে এসে তহুরনের উপর পাশবিক অত্যাচার চালালো। বাম স্তনের উপর বড় ভাইজানের প্রচণ্ড চাপের আঘাতে তহুরন অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরে এলে সে এ বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল। পরদিন সঙ্গোপনে সে খালাম্মা-বিহীন এবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরুল। মগবাজারের চৌরাস্তা ক্রস করার সময় একটি চলন্ত মিনিবাসের ধাক্কায় তার একটি পা জখম হলো। পঙ্গু হাসপাতাল থেকে পা-টি কেটে একটি ক্রাচ দিয়ে ছেড়ে দিল। তহুরনের বাম বুকের আর কোন চিকিৎসা হল না। ক্রাচে ভর করে সে কিছুদিন ভিক্ষা করল। বুকের ঘা দিনের পর দিন মারাত্মক আকার ধারণ করতে লাগল। আস্তে আস্তে সেখানে পোকা বাসা বাধল।

একদিন রাতে নিউমার্কেটের দক্ষিণ গেটের মোটর সাইকেল স্ট্যান্ডে ক্রাচ মাথায় দিয়ে সে ঘুমিয়ে ছিল। সকালে ঘুম থেকে জেগে ক্রাচটি আর খুঁজে পেল না তহুরন। ক্রাচ ছাড়া সে অচল হয়ে পড়ল। কে একজন বলছিল সামনে হাসপাতাল রয়েছে। সেখানে ক্রাচ পাওয়া যাবে। তহুরন কোমর ও দুই হাতে ভর করে রাস্তা ফুটপাথ অতিক্রম করে একদিন ঢাকা মেডিক্যালের গেটে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু দারোয়ান তাকে ভিতরে ঢুকতে না দিয়ে পঙ্গু হাসপাতালের উদ্দেশে তাড়িয়ে দিল। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে

কোমরে হেঁটে এগোতে লাগল।

কার্জন হলের পশ্চিম পাশের সড়কের উপর এসে বড় ভাইজানকে একটি সুন্দরী মেয়ে মোটরসাইকেলের পিছনে তুলে নিতে দেখে তহুরন থেমে গেল। কিন্তু বড় ভাইজানকে কিছু বলার আগেই মোটর সাইকেলটি দ্রুত তার সম্মুখ দিয়ে চলে গেল।

অসুস্থতা আর অনাহারে তহুরনের চলার শক্তি থেমে গেল। সে কোমরে হাঁটারও শক্তি পাচ্ছিল না। থেমে গেল রাস্তার উপরে। কার্জন হলের পশ্চিমপাশে, দোয়েল চত্বরের দক্ষিণদিকের রাস্তায়।

তহুরনের খোলা বুকের দিকে তাকিয়ে পথচারিদের কেউ কেউ ঘৃণায় চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। কেউ মমতায় মানবিক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু কেউ তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল না। অনাহারে অর্ধাহারে তার শরীর কৃশ থেকে কৃশতর হয়ে গেছে। সাদা লম্বা পোকা তহুরনের বাম বুক চুষে খাচ্ছে, যে বুক চুষে মাই খাওয়ার কথা ছিল তার গর্ভজাত সন্তানের। তহুরনের মতো কোন না কোন মায়ের বুক চুষে আমরা প্রত্যেকে খেয়েছি যে মাই।

লাল রঙের ঘাম

গাবতলী থেকে রংপুরে নাইট কোচে চড়ে পলাশবাড়ি নামলাম রাত আড়াইটার সময়ে। আমার উদ্দেশ্য গাইবান্ধা শহরের ডেভিড কোম্পানীর পাড়া যাওয়া, কিন্তু এত রাতে গাইবান্ধা যাবার কোন যানবাহন না পেয়ে বাকি রাতটুকু কাটানোর জন্যে একটি খোলা হোটেলে গিয়ে বসলাম। পলাশবাড়ির এই হোটেলটির দরজা কখনো বন্ধ হয় না। চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। আমি হোটেলে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে তেরো চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে এগিয়ে এলো। আমি শীতে তখন প্রায় কাঁপছিলাম। ছেলেটিকে এক কাপ গরম চা দিতে বলে আমি ব্যাগ থেকে শালটি বের করে জ্যাকেটের উপরে পরে নিলাম। ছেলেটি আবার যখন চা নিয়ে আমার কাছে এলো তখন ভালো করে লক্ষ্য করলাম ওর গায়ে একটি মাত্র হাফশার্ট। উত্তরবঙ্গের ডিসেম্বরের এই শীতে সে আর কিছুই গায়ে দেয়নি। আমার কৌতূহল জাগলো ওর প্রতি। প্রথমে নাম জানতে চাইলাম।

জবরুল। কেন সে শীতের কাপড় পড়েনি, শীতে কষ্ট হচ্ছে কিনা এজাতীয় প্রশ্নের উত্তরে জবরুল জানালো গায়ে দেবার মতো ওর কোন কাপড় নেই। জবরুলের বাবা মারা গেছে কলেরায়। তখন সে খুব ছোট। মা আবার বিয়ে করেছে। কিন্তু সে বাড়িতে জবরুলকে থাকতে দেয় না ওর নতুন বাবা। অনেক বলে কয়ে সে কাজ নিয়েছে এই হোটেলে। সারা রাত ডিউটি। তার বিনিময়ে তিনবেলা খেতে পায়। অবসর সময় হোটেলের পিছনের রান্নাঘরে ঘুমিয়ে কাটায়। মাসে একবার মার সঙ্গে দেখা করতে যায় কয়েক ঘণ্টার জন্যে। এই হচ্ছে জবরুলের জীবনের মোটামুটি চালচিত্র।

আমার ব্যস্ত দিনগুলির আড়ালে পলাশবাড়ির জবরুল হারিয়ে

গিয়েছিল। গেন্ডারিয়ায় মিলনভাইয়ের বাসায় যাবার উদ্দেশে রিকশায় চড়েছি। রিকশা সূত্রাপুর ব্রিজের কাছে আসতেই পেছন থেকে একটি ছেলে রিকশা ঠেলে উপরে তুললো। আমি ছেলেটির হাতে ওর মজুরি দিতে গিয়ে থমকে গেলাম। পলাশবাড়ির জবরুল এখানে এলো কেমন করে? আমি নিশ্চিত হবার জন্যে ছেলেটির নাম জিজ্ঞেস করলাম। নাম ঠিকানা সব ঠিক আছে। সে আমাকে চিনতে পেরেছে কিনা জানতে চাইলাম। 'না' সূচক জবাব দিল।

আমি দেড়বছর আগে পলাশবাড়ির রাতের ঘটনা ওকে স্মরণ করানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। আমার মতো প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রীর সংস্পর্শে আসতে হয়েছে ওকে। ক'জনকে মনে রাখবে। আমি প্রশ্ন করলাম সে ঢাকায় এলো কেমন করে? পলাশবাড়ির হোটেলে ওকে কোন বেতন দিত না মালিক। আরও ভালো কাজের প্রত্যাশায়, বেতনের আশায় জবরুল একদিন ঢাকার উদ্দেশে পাড়ি জমায়। কমলাপুর স্টেশনে নেমে উদ্দেশ্যহীনভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত ঢাকার রাজপথ ধরে সে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে সূত্রাপুরের পুলের কাছে চলে আসে। রিকশা ঢাল থেকে ব্রিজের উপরে তুলে দিলে পয়সা পাওয়া যায়, এই দেখে সে-ও লেগে যায় রিকশা ঠেলার কাজে। সারাদিন এভাবে রিকশা ঠেলে যে টাকা পায় তার প্রায় সবটা চলে যায় ইটালী হোটেলে ভাত খেতে। রাতে ঘুমিয়ে থাকে ফুটপাতে।

আমার রিকশা থামিয়ে জবরুলের সঙ্গে কথা বলায় জ্যাম লেগে যাচ্ছিল। আমি আর কথা না বাড়িয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা করলাম।

এই ঘটনার প্রায় নয় মাস পরে সমুদ্র উপকূলীয় দ্বীপ দুবলার চরে এলাম আমার এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে। দুবলার চরের অধিবাসী ও শুঁটকি প্রজেক্টের ওপর একটি এসাইনমেন্ট তৈরি করার উদ্দেশ্যে দুবলার চর এসেছে সে। আমি বন্ধুটির সঙ্গে ঘুরে

দেখবো দুবলার চর এবং সংশ্লিষ্ট আরও কিছু স্পট। এই সব দ্বীপে উৎপন্ন হচ্ছে কোটি কোটি টাকার শুঁটকি। কিন্তু যারা শ্রম দিচ্ছে এই উৎপাদনে তাদের জীবন বাঁধা রয়েছে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে। প্রতি দিন তারা শ্রম দিচ্ছে ষোল থেকে আঠার ঘণ্টা। বিনিময়ে পাচ্ছে বর্বর যুগের দাসদের জীবন।

সুন্দরবনের কাছাকাছি সমুদ্র উপকূলীয় দ্বীপগুলোতে যেসব শুঁটকির প্রজেক্ট রয়েছে সেখানে সাধারণত কোন স্বাস্থ্যবান যুবা শ্রেণীর শ্রমিক কাজ করতে যায় না। যদিও কিছু কিছু যুবক যায়; কিন্তু এদের মজুরী দিতে হয় সাধারণ শ্রমিকদের দ্বিগুণ তিনগুণ। ফলে প্রজেক্টের মালিকদের টার্গেট থাকে শিশু শ্রমিকদের দিকে। এরা নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভাবগ্রস্ত শিশু কিশোরদের সংগ্রহ করে আনে। এদের দিয়ে তারা সমুদ্রে মাছ ধরানো থেকে শুরু করে শুঁটকি বানানো পর্যন্ত কঠিন কাজগুলি আদায় করে নেয়। প্রায় আঠার ঘণ্টা বিরামহীন শ্রম দিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এরা। বিনিময়ে মালিক পক্ষ থেকে পায় তিন বেলা খাবার। এদের যখন আরও বয়স বৃদ্ধি পায় তখন ফিরে আসার কোন উপায় থাকে না। তখন এরা ভুলে যায় নিজের ঠিকানা। ফিরে আসতে চাইলেও মালিক পক্ষের অদৃশ্য বেড়াজাল এদের আটকে ফেলে। আবার সামুদ্রিক ঝড় এদের কাউকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় খড়কুটোর মতো।

আমরা দু'জন থানা সদরের ডাকবাংলো থেকে একটি শুঁটকি প্রজেক্ট দেখার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলাম ভোরে। মালিক আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন তাঁর বিশাল প্রজেক্ট। তাঁর ব্যবহারে আমরা, বিশেষ করে আমি মুগ্ধ। ভদ্রলোক রাতে তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন খুব করে। ডাকবাংলোয় লোক পাঠাবেন আমাদের নিয়ে যেতে বলে দিলেন তিনি।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে আমাদের নিতে এলো শুঁটকি প্রজেক্টের

এক শ্রমিক। সে বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা কাপড় বদল করে বেরিয়ে এলাম। শ্রমিকটি আমাদের সালাম দিয়ে দাঁড়ালো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। ওর হাতে একটি তেলতেলে লাঠি। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। জবরুল, তুমি?

আমার প্রশ্নে সে একটু থতমত খেল। বললো, আমি হানিফ।

এবার আমি ছেলেটিকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করলাম, তোমার বাড়ি গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে। একটি হোটেলে কাজ করতে সেখানে। পলাশবাড়ি থেকে ঢাকার সূত্রাপুর ব্রিজে রিকশা ঠেলার কাজ করেছ কয়েক মাস আগে।

আমাকে এভাবে বলতে দেখে হানিফ কিছুটা ভীত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। গত তিনদিন দ্বীপের শুঁটকি প্রজেক্টের ছোট ছোট ছেলেদের অমানুষিক পরিশ্রম এবং মালিকদের অত্যাচার দেখে আমার মন মেজাজ খারাপ হয়ে ছিল। মালিকরা যে তাদের শ্রমিকদের নাম বদলে ফেলে এরকম তথ্য এই তিন দিনে আমরা পাইনি। এবার হানিফকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম বদল করেছ কেন?

সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, আমার মালিক বদল করেছে। আমি যদি কোনদিন আমার আসল নাম বলি তাহলে আমাকে বস্তায় ভরে সমুদ্রে ফেলে দেবে মালিক।

হানিফকে এখানে কোন বেতন দেওয়া হয় না। ভালো কাজের লোভ দেখিয়ে সূত্রাপুর ব্রিজ থেকে ওকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। সাতমাস হল সে এখানে এসেছে। এই সাতমাসে সে একদিনও পরিতৃপ্তির সঙ্গে ঘুমাতে পারেনি। মাঝে মাঝে তাকে সমুদ্রে যেতে হয় মাছ ধরা শিখতে। প্রায় কুড়িঘণ্টা মালিকের কাজ করতে হয়। মাছ ধোয়া, রোদে দেওয়া, উল্টে দেওয়া, শুঁটকি শুকিয়ে গেলে তা প্যাকেট করা।

সাংবাদিক বন্ধুটিকে বললাম, আমি যাব না। যেতে চাইলে তুই ঐ নরপিশাচের বাড়িতে যেতে পারিস। এই জবরুলের মতো অসংখ্য মানবসন্তান এখানে হানিফ হয়ে গেছে। যাদের ফোঁটা ফোঁটা রক্তে গড়ে উঠেছে বিশাল শুঁটকি প্রজেক্ট। মালিক আমাদের যা খাওয়াবে তার প্রতিটি গ্রাসে মিশে আছে জবরুলের রক্ত। লালরঙের ঘাম।

আত্মজ

মর্গে কখনো যাওয়া হয়নি আমার। মর্গ সম্পর্কে অনেক রকম মুখরোচক গল্প শুনেছি। পাশাপাশি মর্গের করুণ অবস্থার কথাও জেনেছি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে। আজ মর্গে গিয়ে প্রথম যে দৃশ্য আমার চোখকে আটকে ফেললো তা যেমন অমানবিক, তেমনি হৃদয়বিদারক। কতগুলো অপূর্ণ মানবশিশু একসঙ্গে গাদাগাদি করে রাখা ছিল পূর্ণ মানুষের লাশের পাশে। আমাদের মধ্য থেকে কে একজন অস্ফুটে বলে উঠলো এগুলো অ্যাবোর্শনের বাচ্চা। মাদার তেরেসার একটি আহ্বান তখন আমার মনের ভিতরে গুন গুন করছিল। তোমরা গর্ভপাত না ঘটিয়ে সন্তানদের আমার আশ্রমে দিয়ে দাও। এতগুলো মানবশিশু যারা পূর্ণতা পাবার আগেই মায়ের জঠর থেকে বের হয়ে এসেছে, মাকে সামাজিক বেড়াজাল থেকে মুক্ত রাখতে।

মর্গে শুয়ে রয়েছে শুভ্র। গতকাল সে মারা গেছে। ফার্মগেট থেকে যে টেম্পোগুলো গাবতলী যাওয়া আসা করে, শুভ্র তারই একটিতে হেলপারির চাকুরি করত পেট-ভাতের চুক্তিতে। গতকাল পিছন থেকে একটি ট্রাক এসে শুভ্রর টেম্পোকে ধাক্কা দেয় শ্যামলীর কাছে। টেম্পো থেকে মাটিকে পড়ে গেলে যন্ত্রদানব রাজপথের ওপর ওকে পিষে পালিয়ে যায়। তেরো বছরের শুভ্রর সচল দেহটি নিথর হয়ে যায়। কালো পিচঢালা রাজপথ শুভ্রর রক্তে রক্তিম হয়ে ওঠে।

বাবার দস্তখত ছাড়া শুভ্রর শব মর্গ থেকে ছাড়া দেবে না। কেউ কেউ খুঁজতে বের হল শুভ্রর বাবাকে। অনেক খোঁজাখুজির পর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বাহুবন্ধন থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্ত করে আনা হলো মুনিরকে। শুভ্রর নিশ্চল দেহটি যখন মর্গ থেকে বের

করা হলো তখন ওর বামপায়ের তালুতে অপর একটি মৃতদেহের মাথার ঘিলু লেগেছিল। শুভ্রকে আজিমপুরে সমাহিত করা হলে মুনির চলে গেল তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কাছে। শুভ্রর মা তার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর ঘরে। ওর নানু—যার কাছে শুভ্র থাকত, তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। সে ঘরে শুভ্রর অগ্রজ অভ্র রয়েছে। অভ্রকে নিয়ে ওর নানুর ভয় ছিল বেশি। মাঝে মধ্যে চুরির অভিযোগ আসত তার কাছে। তাছাড়া পাড়ার বকে যাওয়া ছেলেদের সঙ্গে চলত অভ্র, এসব কারণে অভ্রকে নিয়ে ভীত ছিলেন ওর নানু। শুভ্র ছিল শান্ত সুবোধ, পৃথিবীর ভালো'জিনিসগুলো যেমন আগেভাগে ঝরে যায়; শুভ্রর অবস্থাও তাই হল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছুদিন আগের কথা। ফার্মাসিস্ট মুনিরের সঙ্গে পরিচয় হয় মিসেস সুলতানার সঙ্গে। এক পর্যায়ে সে মিসেস সুলতানাকে মা ডাকে এবং তার বাসাতেই মুনির থেকে যায়। মিসেস সুলতানার কাছে থাকত নাহিন, তার বোনের মেয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই মুনিরের সঙ্গে নাহিনের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পূর্বেই নাহিনের প্রেগনেন্সি আসে। তাই বাধ্য হয়ে নাহিনের বাব-মা মুনিরের সঙ্গে বিয়ে দেয়। ইন্টারকনে পার্টি দিয়ে ধুমধাম করে বৌভাত করে মুনির। এই বিয়ে উপলক্ষ্যে মুনির কিছুটা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নাহিনের বাবা প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার এবং একটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ। আর মুনির সেই মেডিক্যালেরই ফার্মাসিস্ট। এরই মধ্যে মোটা অংকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মুনিরের চাকুরি খোয়া যায়। স্বভাব অনুযায়ী তেল দিয়ে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি পায় মুনির। কিন্তু এর মধ্যে দেখা দেয় এক জটিল অবস্থা।

নাহিনের প্রেগনেন্সির সঙ্গে যোগ হয় আরো একটি নতুন উপসর্গ। বাচ্চার সঙ্গে অসংখ্য টিউমার দানা বাধে তার পেটে। নাহিনের সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্যে মেডিক্যাল বোর্ড বসে। কিন্তু কোন ডাক্তারই তার চিকিৎসা করতে সাহস পাচ্ছে না।

নাহিনের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে হলে পেট অপারেশন করা দরকার এবং এই অপারেশন দেশে করা সম্ভব নয়। নাহিনের বাবা স্বহস্তে মেয়ের অপারেশন করেন। তিনি নাহিন এবং নাহিনের গর্ভের সন্তানকে বাঁচাতে সক্ষম হন। কিন্তু নাহিনের সুস্থতা ফিরে আসতে দীর্ঘদিন সময় লেগে যায়। নাহিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যখন পাঞ্জা লড়ছিল তখন মুনির চুটিয়ে প্রেম করে যাচ্ছিল মিসেস সুলতানার মেয়ে শাওনের সঙ্গে। এক পর্যায়ে শাওনকে বিয়ে করে ফেলে মুনির নাহিনের অনুমতি ছাড়াই।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নাহিন সোজা নিজের সংসারে ফিরে আসে। মুনির দুটি ছেলেসহ শাওনকে ফেলে রেখে নাহিনের কাছে ফিরে আসে।

ঢাকার অদূরে একটি ঔষধ কারখানা গড়ে তোলে মুনির। পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে মেডিক্যাল থেকে হাতানো টাকা। মুনিরের আর্থিক অবস্থা ফুলে ওঠে। অপরদিকে দিনের পর দিন চরম আর্থিক সংকটে দু'ছেলে নিয়ে দিন কাটায় শাওন। সুবিধামতো স্থানে শাওনের ছেলে দুটিকে নিজের ছেলে হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না মুনির। দ্বিতীয়বারের মতো বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয় শাওন। কোন রকম আইনের আশ্রয় না নিয়ে নাবালক ছেলে দুটিকে মায়ের কাছে রেখে পুনরায় বিয়ে করে সে।

পিতামাতার স্নেহবর্জিত শুভ্র চরম কষ্টে, খাদ্যাভাবে নানুর কাছে বেড়ে ওঠে। ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে শুভ্র নিজে থেকেই টেম্পোর হেলপারির চাকুরি নেয়। অভ্র নষ্ট হবার পথ ধরে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অফিসঘরে ব্যস্ত থাকে মুনির আরো অর্থ বৃদ্ধির নেশায়।

দুর্ভিক্ষ

শকুনের ঝাঁক মড়ক খুঁজে বেড়াচ্ছে। চাষযোগ্য জমিগুলো ফেটে হাঁ করে আছে, যেন এক একটা ফাটল আস্ত বঙ্গোপসাগরটাকে গিলে খাবে। মসজিদে ময়দানে নামাজ পড়ে প্রার্থনা করা হচ্ছে বৃষ্টির জন্য। গরুর বাঁটে দুধ শুকিয়ে গেছে প্রায়। হাড্ডিসার মানুষের কাফেলা শহরের দিকে এগোচ্ছে কাজের সন্ধানে, অন্নের খোঁজে। ফুলছুড়ির চর থেকে যে কাফেলা গাইবান্ধা শহরের দিকে এগোচ্ছে সেই কাফেলার একজন কুলসুম। শখ করে বাবা-মা বিয়ে দিয়েছিল ওকে একই চরের হাসানের সঙ্গে। কুলসুমের ভার্জিনিটি, কুলসুমের যৌবন চুষে খেয়ে হাসান তাড়িয়ে দিয়েছে দেড় বছরের একটি মেয়েসহ, যা কুলসুমের জন্য হিমালয়ের মতো বোঝা। এই বোঝার ভার সহ্য করে সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় নিজের আত্মজাকে লালন করে আসছিল সে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের বানে একদিন চর ছয়লাপ হয়ে উঠলো, ভাসিয়ে নিয়ে গেল কুসসুমের বুকের নিধিকে; সেই সঙ্গে কুলসুমের বাবাকেও। গত বছর কলেরায় মারা গেছে ওর মা। বেঁচে থাকল কুলসুম আর ময়মুনা দুই বোন।

অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটিয়ে কুলসুমের বয়স যেন ছয় মাসেই এককুড়ি বছর বেড়ে গেল। ভাতের সন্ধানে ময়মুনা একদিন রাতে ফুলছুড়ি থেকে বাহাদুরাবাদগামী স্টিমারে চাপলো ঢাকার উদ্দেশে। তিন তিনটে মাস গত হয়ে গেল। কোন সন্ধান, এমনকি একটা খবর পর্যন্ত পেল না ময়মুনার। যে লোকটি এর আগেও একবার এই চরে এসেছিল ঢাকা থেকে। কাজ দেবার কথা বলে, ভাতের নিশ্চয়তা দিয়ে এই চর থেকে সেবার আরও কজন মেয়েকে ঢাকা নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিকে রেখে কুলসুমকেও যেতে বলেছিল তার সঙ্গে। কিন্তু লোকটির কথাবার্তা চালচলন কুলসুমের

ভালো লাগেনি। লোকটা নাকি এই চরের মাস্তান বুড্ডার বন্ধু। শেষ পর্যন্ত ময়মুনা সেই খারাপ লোকটির সঙ্গে ঢাকা গেল!

ময়মুনার চিন্তার থেকে নিজের চিন্তা কুলসুমকে বেশি করে ভাবনায় ফেলল। আজ চারদিন গত হয়ে গেল, ব্রহ্মপুত্রের জল ছাড়া কিছুই ওর পেটে পড়েনি। এই চর থেকে প্রতিদিন দলে দলে নারীপুরুষ চলে যাচ্ছে শহরের দিকে কাজের আশায়, অন্নের সন্ধানে। গতকালও করিমনের মা যাবার সময় কুলসুমকে ওদের সঙ্গে যাবার জন্য বলেছে। কিন্তু কুলসুমের যে যেতে ইচ্ছে করে না। অথচ এই চরে পড়ে থাকলে কোথায় পাবে সে কাজ, আর কেমন করে পাবে আহার।

আজ যে দলটি গাইবান্ধা শহরের দিকে যাচ্ছে অনেক ভেবে চিন্তে তাদের সঙ্গে যোগ দিল কুলসুম। শহরে নাকি অনেক ভাত, প্রচুর কাজ। বেঁচে থাকলে আবার সে ফিরে আসবে তার পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান ফুলছুড়ির এই চরে।

গাইবান্ধা স্টেশনে যখন ট্রেন থামল ওদের দলের অনেকেই বিভিন্ন দিকে ছুটে গেল। যে ক'জন অবশিষ্ট থাকল তাদের সঙ্গে শহরের ভিতরের দিকে হাঁটতে লাগল কুলসুম। স্টেশন থেকে কিছুটা পূর্বদিকে এসে ওদের ছোট কাফেলাটি থেমে গেল। গাইবান্ধা পৌরসভার সামনে যে কিউ দাঁড়িয়েছিল ওরা সেই লাইনে দাঁড়িয়ে গেল খিচুড়ির আশায়। এক বাটি খিচুড়ি পেয়ে কুলসুমের মনে হল সে সমগ্র পৃথিবী পেয়ে গেছে। তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠল। কিন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তি হল না, তবুও তো কিছু খেতে পারলো সে। শহরের মানুষগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল কুলসুমের মন।

স্টেশনের ধূলা ঝেড়ে শুয়ে পড়লো কুলসুম ওরই শ্রেণীর একপাল মানুষের পাশে। রাতে ভালো ঘুম হল। ওরা সকালে উঠে একা একাই চলে এলো গতকালের জায়গায়, যেখানে খিচুড়ি পেয়েছিল। কিন্তু আজ কোন লোক সমাগম দেখল না। ভিতরে কিছুর আয়োজন হচ্ছে বলেও টের পাওয়া গেল না। খিচুড়ির

প্রতীক্ষায় সারাটা দিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় উঠে পড়ল। এক মুঠো ভাতের আশায় অনেক বাসার গেট ঘুরে ব্যর্থ হল। অবশেষে ক্লান্ত শরীরটি বিছিয়ে দিল এক বারান্দার মেঝেতে। ঘুম আসছিল না কুলসুমের। গভীর রাতে কুলসুম দেখল তার মতোই আরো ক'জন অন্নসন্ধানী এই বারান্দায় তার পাশে এসে শুয়ে পড়লো। ক্ষুধার কষ্টে একটি কচি কণ্ঠ কেঁদে উঠল হঠাৎ। বাচ্চার মা ধমকালো, মারল। কিন্তু কান্না থামল না। অবশেষে ভিতর থেকে দরজা খোলার শব্দ পেল কুলসুম। কিছুটা আশান্বিত হল সে। কিন্তু খাদ্যের পরিবর্তে এক বালতি জল ঢেলে দিল ওদের গায়ে এবং সেই সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল ওদের এই বারান্দা ছেড়ে চলে যাবার জন্যে। দুর্বল শরীরটাকে টেনে আস্তে আস্তে স্টেশনের দিকে আসতে লাগল সে। পথে দুটি লোক কুলসুমকে থামালো। সে বুঝতে পারল না এরা কারা। পাড়ার মাস্তান না পুলিশ। অনেক ফন্দি-ফকির করেও যে কাজটি চরের বুড্ডা করতে পারেনি, আজ গভীর রাতে অসহায় ক্ষুধার্ত কুলসুমের শরীরের উপর এই অপরিচিত লোক দুটি তাই করল। কুলসুমের দেহটাকে খেয়ে ছিন্ন ভিন্ন করল ওরা। কুলসুম যেন কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় স্টেশনে ফিরে এলো। সারারাত ঘুম হল না ওর। এভাবে ঘুমহীন অন্নহীন অবস্থায় তিন দিন চার রাত কেটে গেল গাইবান্ধা স্টেশনে।

কুলসুমের নড়াচড়ার ক্ষমতা রহিত হয়ে গেছে। কথাও প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। নলডাঙ্গার দিক থেকে আসা লোকাল ট্রেনটি গাইবান্ধা স্টেশনে থামল। তার ভিতর থেকে একজন যাত্রী একরকম দৌড়ে বের হয়ে এলো প্ল্যাটফর্মে। কুলসুমের গায়ের কাছে এসে বমি করে দিল সে। দুটি লোমতোলা কুকুর দৌড়ে এসে সেই বমি খেতে লাগল। অতি কষ্টে নিজের শরীরটাকে একটু নাড়িয়ে কুকুর দুটিকে ধাক্কা দিয়ে দুহাতে বমি তুলে খেতে লাগল কুলসুম। কুকুর দুটিও এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে ভাগ বসাল।

ভাঙনের ফসল

পদ্মার ভাঙন দেখতে এসেছে অসংখ্য নারী পুরুষ। তবে আজ-কাল মহিলারা একটু কম আসছে। জনৈক পীর সাহেব নাকি বলেছে পদ্মার ভাঙন দেখতে মহিলারা এলে ভাঙন আরও দ্রুত গতিতে হবে। স্থানীয় লোকেরা মহিলাদের আসতে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধ উপেক্ষা করেও পুরুষদের পাশাপাশি বহু মহিলা প্রতিদিন আসছেন। গাড়ি ভরে ঢাকা থেকে লোক আসছে। দূর দূরান্ত থেকে নৌকা, শ্যালোবোট ভরে আসছে মানুষ।

পদ্মা গ্রাস করে নিচ্ছে কুমারভোগ, ঝাউটিয়া, দিঘলী, লৌহজং, কদম পাগলের মাজার। কদম পাগলের মাজার ভাঙতে দেখে সবাই হতাশ হয়ে গেল। এবার বোধহয় আর রক্ষা পাবে না সমগ্র লৌহজং। পাগলের মাজারের মাথার কাছে পনের ভরি ওজনের সোনার মুকুট ছিল, সেটাও বাঁচাতে পারলো না কেউ। মাজারের সঙ্গে শত হাত জলের নীচে চলে গেল। মুকুটটির জন্যে আয়নালের একটু খারাপ লাগল। এভাবে নদীতে ডুবিয়ে না দিয়ে তাকে যদি মুকুটটি দিয়ে দিত তাহলে সে আর নুরুদের বাড়িতে থাকত না, নুরুর বাবার চোখ রাঙানি, মুখ ভ্যাংচানি দেখতে হত না। পাগলের জন্যে তার ভক্তরা বিলাপ করে কাঁদছে। আজ থেকে বাইশদিন আগে আয়নালও কেঁদেছিল তার বাবা-মার জন্যে। এখনো কাঁদে। তবে বিলাপ করে নয়। বাবা-মার শোক আস্তে আস্তে আয়নালের কাছে হালকা হয়ে আসছে।

পাগলের মাজার দেখে আয়নাল নুরুদের বাড়ি ফিরছিল যে পথ ধরে, এ পথ তার দীর্ঘ দিনের চেনা। এপথ ধরে এগিয়ে যেত সে নদীতে, গোসল করতে। এ পথের দক্ষিণ দিকের অংশ পদ্মা গ্রাস করে নিয়েছে। পথের শেষ প্রান্তে খেজুর গাছের একটা সারি ছিল। খেজুর গাছের ছায়ায় সে বন্ধুদের নিয়ে ডাংগুলি খেলেছে।

খেলাচ্ছলে সে কত ঘর, বড় বড় বাড়ি কিনেছে। অথচ আজ তার থাকার মতো একটিও ঘর নেই। যে পদ্মায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুব দিয়েছে, বন্ধুদের নিয়ে সাঁতরে চরে গিয়েছে। সেই পদ্মায় এখন আর গোসল করে না। নামতেও ভয় পায়। তার জন্মের পরে পদ্মাকে এমন হিংস্র আর দেখেনি। পদ্মা গ্রাস করে নিয়েছে তার শৈশবের চারণক্ষেত্র। আর কোন দিন ফিরে পাবে না তার শৈশব। সেই খেজুর গাছের সারি।

ভাবতে ভাবতে সে হাঁটছিল নুরুদের বাড়ির দিকে। এই বাড়িতে যেতে এখন তার ভয় লাগে। লজ্জাও করে। নুরুর মা আজ বাইশদিন যাবৎ তাকে নুরুর মতোই আদর করে। খাওয়ায়। থাকতে দেয়। অবশ্য নুরুর সঙ্গে সে আরও আগে থেকেই ঘুমায় নুরুদের বাড়িতে। আজ থেকে বাইশ দিন আগে রাতে খেয়ে মার কাছে বলে নুরুদের বাড়িতে ঘুমাতে এসেছিল। সেটাই তার মার সঙ্গে শেষ দেখা, সকালে এসে দেখে তাদের বাড়ির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে পদ্মায়। একটি মাত্র ঘর ছিল তাদের। সেই ঘর গ্রাস করে নিয়ে পদ্মা সেখানে ফুঁসছে বিষধর সাপের মতো। অনেক খুঁজেও আয়নাল তার বাবা মা আর তিনটি ভাইবোনের সন্ধান পায়নি। তাদের লাশও না। জীবিত অথবা মৃত বাবা মার খোঁজে সে প্রতিদিন নদীর তীরে যায়।

পরশুদিন সে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে। নদীর তীরে যে জায়গায় বসেছিল আর ক'মিনিট সেখানে বসে থাকলে মা বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। আয়নাল উঠে আসার কয়েক মিনিট পরেই সে জায়গাটি চারদিকে গোলচক্র ধরে নদীতে মিশে গেল। একটু আগে যেখানে ছিল মাটি, সেখানে পদ্মা এখন ফুঁসছে। এভাবে প্রতিদিন ভেঙে যাচ্ছে জনপথ, ঘরবাড়ি, হাটবাজার। আরও কত কি।

আয়নালের বাবা মা পদ্মায় বিলীন হয়ে যাবার পরে নুরুর মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কান্নাকাটি থামিয়েছে। শত শত লোক এসেছিল আয়নালকে দেখতে। কিন্তু কেউ ওকে তাদের সঙ্গে নেয়নি। নুরুর

মা জোর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছে। নুরুর মতোই সে আয়নালকে আদর করে। নুরুর সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ায়। নুরুও তাকে আগের মতো ভালোবাসে। কিন্তু নুরুর বাবা প্রথমদিকে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেও, আজ কদিন থেকে খুব খারাপ ব্যবহার করছে। সে আয়নালকে কাজ খুঁজে নিতে বলছে, তার বাড়ি থেকে চলেও যেতে বলেছে।

কোথায় পাবে কাজ। আগে যখন আয়নালের বাবার রোজ কামাই যেত অথবা অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে থাকত, তখন ওর মা বাদাম ভেজে পাঠিয়ে দিত 'পদ্মা' হলে বিক্রি করতে। সেই সিনেমা হল তো এখন নদী গিলে খেয়েছে। মাঝে মাঝে সে দিঘলী বাজারে মনির ব্যাপারীর আড়তে চা পান আনার কাজ করত। এখন তো সমস্ত দিঘলী বাজারই পদ্মার অংশ হয়ে গেছে। কোথায় পাবে সে কাজ? অহরহ এই ভাবনা আয়নালকে আচ্ছন্ন, চিন্তিত করে তুলল।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে কাউকে কিছু না বলে সে ঘোড়দৌড় থেকে ঢাকার বাসে চড়ে বসল। রাস্তায় কন্ডাক্টর যখন ভাড়া চাইল, তখন সে কেঁদে ফেলল। তার কাছে একটি টাকাও নেই। দয়াপরবশ হয়ে বাসের ড্রাইভার আয়নালকে ঢাকা পর্যন্ত নিয়ে এলো, এর আগে সে আর ঢাকা আসেনি। কোথায় যাবে সে? কে ওকে কাজ দেবে? সামনেই দেখল কিছু মানুষ একসঙ্গে টেলিভিশন দেখছে। ভিক্টোরিয়া পার্কের ভিতরে অন্যদের সঙ্গে টিভি দেখল আয়নাল। টেলিভিশন বন্ধ হয়ে গেলে কেউ কেউ চলে গেল। বাকিরা শুয়ে পড়ল ১৮৫৭ সালের সিপাহীদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভের বেদীতে। আয়নালও ওদের সঙ্গে শুয়ে পড়ল এক সিঁড়িতে।

ক্ষুধার তাড়নায় ঘুম ভেঙে গেল আয়নালের। সে বুঝতে পারল না রাতের গভীরতা কত। উঠে বসল আয়নাল। দু'হাতে চোখ ভালো করে ঘষে সে আবার দেখে নিল। হ্যাঁ, একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার দু হাতে দুটি বন্দুক। লোকটি কি পুলিশ? কিন্তু পুলিশের পোশাক তো খাকী, সে লৌহজং থানায় দেখেছে। লোকটি তো পরেছে নীল শার্ট খাকী প্যান্ট। দাঁড়ানো লোকটির পাশে আর

একটি লোক উলঙ্গ হয়ে নড়াচড়া করছে। সে আরো ভালো করে দেখে নিল উলঙ্গ লোকটির শরীরের নিচে একটি দোমড়ানো ছাপা শাড়ী দেখা যাচ্ছে। সেখানে একটি নারীকণ্ঠও শুনতে পেল আয়নাল। ভয় পেল সে। আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু চোখ বন্ধ করল না। উলঙ্গ লোকটি উঠে দাঁড়াল। প্যান্ট পড়ে সে বন্দুক দুটি হাতে নিল ততক্ষণে অপর লোকটি উলঙ্গ হয়ে ছাপা শাড়িটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে গেল। ওর পাশে শুয়ে আছে আরও কজন। যারা ভিন্ন ভিন্ন বয়সের। এদের কেউ দেখছে না এ দৃশ্য।

দ্বিতীয় লোকটি উঠে দাঁড়ালো। লোকটির শরীরের নীচ থেকে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়ালো। শাড়ি গায়ে জড়াতে জড়াতে সে লোকটির কাছে টাকা দাবি করল। টাকার অঙ্কটাও শুনল আয়নাল। কিন্তু লোক দুটি মেয়েটিকে টাকা দিচ্ছে না। উল্টে টাকা চাচ্ছে মেয়েটির কাছে। মেয়েটির কথায় মমার্থ হচ্ছে আর একটু পরে আজান পড়বে। সারারাত একটি কাস্টমার পাইনি তোমাদের টাকা দেব কোত্থেকে। কিন্তু পুলিশ দুটি নাছোড়। টাকা না দিলে মেয়েটিকে থানায় নিয়ে যাবার ভয় দেখাচ্ছে। মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে অশ্রাব্য ভাষায় উচ্চৈস্বরে গালাগালি করছে পুলিশ দু'টিকে। তবুও পুলিশ দুটি টাকা চাচ্ছে মেয়েটির কাছে।

আজানের শব্দে আয়নালের পাশের সিঁড়িতে শুয়ে থাকা লোকটি উঠে বসল। সে ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু একবারও তাকাল না। লোকটিকে ভিক্ষুক মনে হল আয়নালের। সে লোকটির পিছু পিছু হাঁটতে লাগল, একটি বড় মসজিদে ঢুকে পড়ল লোকটি। আয়নাল কিছুক্ষণ মসজিদের গেটে দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে লাগল। তার মতো অনেক লোক শুয়ে রয়েছে ফুটপাতে সদরঘাট টার্মিনালে, সামনে নদী দেখে সে আর এগোলো না। নদীকে সে সবচেয়ে বেশি ভয় করে এখন।

কিছুদিন আগেও নদী তার খুব প্রিয় ছিল। বুড়িগঙ্গা নদীকে পেছনে রেখে সে হাঁটতে লাগল। লোকজন চলাচল শুরু হয়েছে কিছু কিছু। কারও কাছেই কিছু চাইতে লজ্জা লাগছে আয়নালের।

কিন্তু ক্ষুধা মুচড়ে উঠছে পেটে। একটি হোটেলের সামনে দাঁড়াল আয়নাল। হোটেল থেকে ওর বয়সী ছেলে ধমকে তাড়িয়ে দিল আয়নালকে। ছেলেটি আয়নালকে ভিক্ষুক বলায় তার খুব কষ্ট লাগল। দিঘলী বাজারের কেউ তাকে ভিক্ষুক বললে এক হাত দেখে নিত। কিন্তু এখানে কিছুই বলল না। হাঁটতে লাগল সে।

হেঁটে হেঁটে গুলিস্তান চলে এল। গুলিস্তানের একটি রোড ডিভাইডারের উপরে নিঃসাড় শরীর নিয়ে বসে পড়ল আয়নাল। ওকে এভাবে বসে থাকতে দেখে একটি লোক এগিয়ে এল। মিষ্টি স্বরে কথা বলল। লোকটি আয়নালকে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে রাজী হল সে।

আয়নালকে নিয়ে একটি রিকশায় উঠালো লোকটি। রিকশাটি অনেকক্ষণ চলার পর লোকটির নির্দেশ মতো থামল একটি গলির মাথায়। আয়নাল লোকটির সঙ্গে রিকশা থেকে নেমে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ এগিয়ে একটা গেটে টোকা দিল লোকটি। গেটটি খুলে গেল। তারা ভিতরে ঢুকল, বন্ধ হয়ে গেল গেট। লোকটি নিজে বসে বসে আয়নালকে খিচুড়ি খাওয়ালো। এরপর জানতে চাইল সে কাজ করবে কিনা। আয়নাল হ্যাঁ সূচক জবাব দিল। লোকটি আয়নালকে নিয়ে একটি ঘরে ঢুকে গেল। ঘরের মেঝে থেকে একটি ঝাঁপ তুলল। ঝাপের তলা থেকে একটি সিঁড়ি বেরিয়ে গেল। লোকটি নীচে নেমে গেল। আয়নাল খুব অবাক হল মাটির তলায় ঘর দেখে। মাটির এই ঘরে বিভিন্ন বয়সের কয়েকজন লোককে শুয়ে থাকতে দেখে সে আরও অবাক হল। শুয়ে থাকা লোকগুলি লোকটির ডাকে উঠে দাঁড়াল। সে আয়নালকে দেখিয়ে বলল, এটাকে মাস খানেক ট্রেনিং দিতে হবে। লোকগুলির মধ্য থেকে একজনের হাতে আয়নালকে বুঝিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদ্য পরিচিত লোকটি আয়নালকে কিল, ঘুষি, লাথি মারতে শুরু করল। আয়নাল যার সঙ্গে এখানে এসেছে ছুটে গেল সেই লোকটির কাছে। সে-ও এক লাথি মারল এবং ট্রেনিং নেওয়ার জন্যে বলল। আয়নাল যতক্ষণ মাটিতে পড়ে না গেল ততক্ষণ এভাবে চলল

ওর উপর অত্যাচার।

এরপর তিনমাস আয়নালকে মাটির নীচের সে ঘর থেকে আর বের হতে দেওয়া হয়নি। নানা রকম কৌশল শিখিয়ে আরও দু'জনের সঙ্গে একদিন ওকে পাঠানো হল ফুলবাড়িয়া মাওয়া বাস স্ট্যান্ডে। আজকে তার কাজের প্রথম দিন। এই তিন মাস চলেছে ট্রেনিং।

মিনিবাসের দরজা দিয়ে উঠছে একটি লোক, তার দু হাতে দুটি ব্যাগ। ডান পা-টি বাসের পাদানিতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আয়নালরা বুঝে ফেলল। কিন্তু আয়নালের খুব খারাপ লাগছে লোকটির পকেটে হাত দিতে। অথচ ওর সঙ্গী দু-জন নাছোড়। মুহূর্তের মধ্যে ওরা তিন জন লোকটির সঙ্গে সঙ্গে বাসে উঠে গেল, লোকটিকে প্রচ্ছন্নভাবে ঘিরে ফেলল। কিন্তু লোকটি কিছু বুঝতে পারল না। আয়নাল এই তিনমাসে যে শিক্ষা পেয়েছে তা বাস্তবায়িত হল। লোকটির প্যান্টের ডান পকেটের সব টাকা এসে গেল আয়নালের হাতে। আয়নাল সেটা হস্তান্তর করে ফেলল অপর সঙ্গীর হাতে। সঙ্গীটি নেমে গেল। আয়নাল বাস থেকে নামল সবার পরে, ফিরে এল সেই মাটির তলার ঘরে। ওর মালিক সাবাস জানাল।

জয়দেবপুরের সেই পাগলটি

একটি মঠ। মঠের চারপাশ ঘিরে আরও কটি ছোট ছোট মঠ। এই মঠের নিচে কিছু ছোট কক্ষ, সেগুলো জীর্ণতার ছোঁয়ায় মাটির সঙ্গে মিশে যাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পশ্চিম পাশের ছোট মঠটি অক্ষত আছে, যা সন্ন্যাসী রাজার পত্নী গড়েছেন স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশে। মন্দিরের ভিতরে স্যুট পরা শ্বেতপাথরে খোদাই করা রাজার একটি ছবি। ভিতরের বেদীতে একটি শিবলিঙ্গের ভাঙা অংশ। সেখানে একটি লাল কাপড় বিছিয়ে পরম ভক্তির সঙ্গে পূজা করে পার্বতী। পার্বতীরানী দে। বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে পার্বতী। মাথায় জট, শাড়ির উপরে এপ্রোনের মতো একটি সাদা শার্ট পড়ে পার্বতী। এটি তার গুরুদেবের শার্ট। শার্টের পকেটে দুটি সিগারেটের প্যাকেটের সঙ্গে আরও কিছু কাগজ। কটি টাকা। ভালোবেসে, ভক্তি করে লোকজন তাকে খাওয়ায়, টাকা দেয়, সিগারেট দেয়। কিন্তু সে সিগারেট খায় না। পকেটে জমায়। যাকে ভালো লাগে খেতে দেয় সিগারেট, লজেন্স। যাকে আরও ভালো লাগে তার সঙ্গে বসে গল্প করে। গান শোনায়। বিরহের গান।

আজ পার্বতীর মন ভালো নেই। ডি সি অফিসের মালী প্রতিদিনের মতো আজকে তাকে ফুল দেয়নি, এই ফুল দিয়ে সে প্রতিদিন পূজা দেয় সন্ন্যাসী রাজার মন্দিরে। দুপুর বারোটার মধ্যে তার পূজা শেষ হয়ে যায়। পূজা শেষে সে দুপুরের খাবার খায়। অবশ্য সে সারাদিন একবারই খায়।

নতুন জেলা প্রশাসক আসার ক'দিন পরেই মালীকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন প্রতিদিন পার্বতীকে ফুল দিতে। কথাটি তিনি পার্বতীর সম্মুখেই বলেছিলেন। এরপর থেকে প্রতিদিনই মালী তাকে ফুল দিয়ে আসছিল। কিন্তু কদিন থেকে সে ফুল দিতে নানা রকম টালবাহানা করছে।

পার্বতী যে ছোট মন্দিরটিতে পূজা দেয়, মন্দিরটি দীর্ঘকাল অযত্নে অবহেলায় পড়ে ছিল। দুপুরের খররৌদ্রে অথবা বৃষ্টির সময় গরু ছাগল এসে মন্দিরে আশ্রয় নিত। আড়াল পেয়ে অবুঝ লোকেরা মন্দিরের ভিতরে প্রাকৃতিক কাজও করত। সে সব পরিষ্কার করে এখন প্রতিদিন সে পূজা দেয় মন্দিরে।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় মন্দিরের দরজা জানালা লুট হয়ে গিয়েছিল। বাঁশের ফালি দিয়ে সে দরজা বানিয়েছে। পশুরা আর যখন-তখন ভিতরে ঢুকে এখন আর মন্দির অপবিত্র করতে পারে না।

এই শ্মশানঘাটেই দাহ করতে আনা হয়েছিল ভাওয়াল রাজাকে। যিনি পরবর্তী সময়ে ভাওয়াল সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাস রাজা নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর শ্মশানের প্রায় সব জায়গাই এখন বেদখল হয়ে গেছে। গড়ে উঠেছে লালমাটি অথবা টিন/কাঠের ঘর। নতুন বসতি। মঠ, মন্দির, শ্মশান আর শ্মশানের পশ্চিম দিকের ছোট পুকুরটি, যা এখনও দখল করে নেয়নি কোন লোভী পশু। এই হচ্ছে পার্বতীর বিচরণ ক্ষেত্র। জয়দেবপুর নামটি পাল্টে গাজীপুর করায় পার্বতীর খুব খারাপ লাগে। কিন্তু কাউকে বলতে পারে না।

ফুল না পেয়ে সে পুকুরের পশ্চিম দিকের ভাঙা ঘাটের একটি ভাঙা সিঁড়িতে বসে আছে মন খারাপ করে। ডি সি-র মালী রহমত আলী আজ ফুল দেবার কথা বলে পার্বতীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। মালী ফুল তুলে ঘরে রেখে দিয়েছে পার্বতীর জন্যে, রহমত আলির কাছ থেকে এরকম আশ্বাস পেয়ে মালীর পিছু পিছু তার ঘরে ফুল আনতে গিয়েছিল সে। তারা দু'জনে ঘরে ঢোকার পর সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল রহমত আলী। পার্বতী চিৎকার করতে পারেনি। সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তার মনে পড়ে যাচ্ছিল '৭১ সনের কথা।

সে তখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ে। তাদের কলেজ খোলা থাকলেও ছাত্রছাত্রীর অভাবে ক্লাস হচ্ছিল না। যুদ্ধের আতঙ্কে

কেউ আসছিল না কলেজে। পার্বতীকে তার বাবা কলেজে যেতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। অথচ কলেজে যাওয়ার জন্যে তার মন ছটফট করছিল। কলেজে যেতে না পারলে সমীরের সঙ্গে তার দেখা হয় না। সমীরকে একদিন দেখতে না পেলে তার মন ছটফট করে ওঠে। সব কিছু পানশে লাগে। বিবর্ণ মনে হয়।

হানাদার বাহিনী ডাকবাংলোয় ক্যাম্প করেছে ক'দিন আগে। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে দলে দলে হানা দিচ্ছে বিভিন্ন বাড়িতে, পাড়ায়। ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গোয়াল থেকে গরু খাসি। ঘর থেকে উঠতি বয়সী মেয়েদের, নিরীহ মানুষের উপর চালাচ্ছে অত্যাচার। এ পর্যন্ত অনেককে হত্যা করেছে। হিন্দু বাড়িগুলিতে দিচ্ছে আগুন। ওরা আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজন লুট করে নিয়ে যাচ্ছে সে সব বাড়ি। পার্বতীকে তার বাবা পাঠিয়ে দিলেন কালিয়াচকে। তার মামার বাড়ি। সেখানে একদিন সন্ধ্যায় সমীর এসে উপস্থিত হল। পার্বতীর কাছে বিদায় নিতে। সমীর যাচ্ছে ভারতে, ট্রেনিং নিতে। এসব কথা সে পার্বতীকে খুব দ্রুত বলে যাচ্ছিল। তার অন্যান্য সঙ্গীরা অপেক্ষা করছিল, বসার সময় ছিল না সমীরের। সে যেমন দ্রুতবেগে এসেছিল, তেমনি বাতাসের বেগে চলে গেল। যাবার সময় শুধু পার্বতীর হাতটি একবার ধরেছিল। সেটাই সমীরের শেষ স্পর্শ। শেষ আদর।

সমীরকে এরপরে সে যেদিন দেখেছিল সেদিন ছিল আষাঢ়ের চার তারিখ। মুষলধারায় বৃষ্টি ঝড়ছিল আকাশ ভেঙে। সমীরের বন্ধু মাঈনুল এসে খবর দিয়েছিল পার্বতীকে। সে কালিয়াচক থেকে ছুটে গিয়েছিল জয়দেবপুর। সমীরদের বাড়িতে। কিন্তু ততক্ষণে শব শ্মশানঘাটে চলে গেছে। পার্বতী ছুটেছিল শ্মশানে। সমীর তখন উঠে গেছে চিতায়। মুখাগ্নি দেওয়ার আয়োজন চলছে। পার্বতী আছড়ে পড়ল চিতায়, তাকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে নেওয়া হল চিতা থেকে। সমীর যখন জ্বলে উঠলো, এক বিকট চিৎকারে পার্বতী লুটিয়ে পড়ল।

সেই থেকে সে অসুস্থ। এই শ্মশানে সে প্রতিদিন এসে বসে

থাকে। প্রথম দিকে সে কথা বলত না। জোর করে খাওয়াতে হত। আস্তে আস্তে সে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সবাই তাকে পাগল বলতে লাগল। শ্মশানঘাটে বসে থাকলে ছোট বাচ্চারা তাকে ঢিল ছুড়ত। সে বসে থাকত সমীরের অপেক্ষায়। সে এখনও বিশ্বাস করে সমীর ফিরে আসবে। যেমন এসেছিলেন ভাওয়াল রাজা।

এ রকম বৃষ্টির দিনেই তো ভাওয়াল রাজাকে শ্মশানঘাটে দাহ করতে আনা হয়েছিল। তিনি যেমন ফিরে এসে ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিলেন, সমীরও তেমন করে ফিরে আসবে। সমীর ফিরে এসে কোন ইতিহাস হবার প্রয়োজন নেই। কারও জানার দরকার নেই। শুধু সে জানলেই হবে। সমীর যে তাকে স্বপ্নে বলেছে সে ফিরে আসবে। বাড়িতে তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। সেই বাঁধন ছিঁড়ে সে চলে আসে শ্মশানে। বসে থাকে ঘাটের সিঁড়িতে। সমীরের অপেক্ষায়।

এভাবে পার্বতীকে বসে থাকতে দেখে একদিন তিনটি লোক এসে তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেল পাশের মঠে। যে শিবলিঙ্গে অসংখ্য দিন পার্বতী পূজা দিয়েছে তার পাশে ফেলে লোক তিনটি পর্যায়ক্রমে তাকে বিবস্ত্র করে যা করল্ তা সে চায়নি। অস্ত্রধারী এই বিজাতীয় তিনটি পশুর হাত থেকে শিব তাকে রক্ষা করতে পারল না।

আজ ডি সি সাহেবের মালী দ্বিতীয়বারের মতো পার্বতীকে সে কাজটি করল। সে কি জবাব দেবে সমীরকে? সে তো স্বপ্নে বলেছে ফিরে আসবে। ডি সি সাহেবের কাছে কি বিচার চাইবে? কিন্তু বিচার দিলে তো মালীর চাকুরি চলে যাবে। বৌ বাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরবে রহমত আলি। পার্বতীর আর এই শ্মশানঘাটে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। সমীর যদি এখন চলে আসে তাহলে সে কি জবাব দেবে? কেমন করে এই মুখ দেখাবে সমীরকে? সে শ্মশান ছেড়ে হাঁটতে লাগল। লালমাটির বুক চিরে দাঁড়িয়ে আছে ইরিধানের সারি। সবুজ ধানের বুক চিরে চলে

গেছে ক্ষেতের আল। পার্বতী হাঁটতে লাগলো, সে আল ধরে।

হঠাৎ সে মাথায় আঘাত পেল। পড়ে গেল সবুজ ধান ক্ষেতে। পার্বতীর সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে ঘুরতে লাগল। দৌড়ে এল দুটি লোক। তাদের একজনের হাতে বন্দুক। শিকারে বেরিয়েছিল এই হিংস্র মনুষ্য সন্তান। ধানক্ষেতের আলে বসে থাকা সাদা বকের দিকে তারা যে গুলি ছুড়েছিল তা লক্ষ্যভেদ হয়ে পার্বতীর মাথায় লেগেছে। তারা যখন পার্বতীর কাছে এল তখন সব শেষ।

সমীর এসেছিল। পার্বতী চলে গেছে সমীরের সঙ্গে। রহস্যময় আর এক পৃথিবীতে, যে পৃথিবী থেকে কেউ কখনও ফিরে আসেনি।

টয়োটা স্টারলেট ৩০৯৫

সোনালী ব্যাংকের হেড অফিসে ব্যক্তিগত কাজে গিয়েছিল মিসকাত। এখানে কাজ শেষে দিলখুশার আরও একটি অফিসে যাবার উদ্দেশ্যে সে বেরিয়ে এলো ব্যাংকের পেছনের গেট দিয়ে, গ্যারেজের পাশ দিয়ে। পুলে অপেক্ষমাণ একটি টয়োটা স্টারলেট গাড়ির নম্বর প্লেট দেখে সে থমকে দাঁড়াল। আরও একটু স্পষ্ট করে দেখার উদ্দেশে দু'পা এগিয়ে গেল সে। হ্যাঁ গাড়ির নম্বর ঠিকই আছে ঢাকা ঘ ত্রিশ পঁচানব্বই। তাকিয়ে থাকল সে গাড়িটির দিকে। যেমন তাকিয়ে থাকে সে মগবাজার দিয়ে যাবার সময় আহসান ক্লিনিকের দিকে। এই ক্লিনিকের সম্মুখ দিকে একটি বিপণি-কেন্দ্র গড়ে ওঠায় এখন আর ভালোভাবে রাস্তা থেকে দেখা যায় না আহসান ক্লিনিক। তবে তিনতলার নির্দিষ্ট রুমটির দিকে তাকাতে মিসকাতের চোখ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে এবং সেদিক তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে তার অজান্তেই মুখ দিয়ে একটি দোয়া বেরিয়ে আসে, যে দোয়াটি কোন কবর দেখলে সাধারণত মুসলমানরা পড়ে।

মিশকাতের ইচ্ছে হলো গাড়িটির পেছনের দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে বসতে। যেখানে অসংখ্য দিন বসেছেন তার সেই প্রিয় মানুষ। সনজিদা খানম। মিসকাতের মা। না, তার গর্ভে জন্ম নেয়নি সে। তবে অনেকে গর্ভে ধারণ না করেও যে মা হন, সনজিদা খানমের সঙ্গে মিশকাতের পরিচয় না হলে সে কোনদিনই একথা মানতে পারত না। যেমন পারে না পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ। মিশকাত তাকে প্রথম দেখে রাড়িখালে। বিক্রমপুরের রাড়িখালের একটি বাড়ি, সে বাড়িটির চারদিকে সেদিন বর্ষার জলে টুইটুম্বর ছিল। জলের বুক চিরে মিশকাতের নৌকা যখন বাড়িটির ঘাটে

গিয়ে থামলো, তখন সে কিছুটা জড়তায় জড়িয়ে গিয়েছিল। তার এই জড়তা কাটিয়ে উঠতে সহযোগিতা করেছিলেন সনজিদা খানম। মিশকাত নৌকা থেকে নামবে কি নামবে না, এই ইতস্তত অবস্থায় জড়তায় ভুগছিল। তখন প্রথম কথা বললেন সনজিদা খানম। তাঁর কথার জবাব দিতে গিয়ে জড়তা কেটে গেল মিশকাতের। সেদিন থেকেই মিশকাতের মনের গভীরে সনজিদা খানমের একটি আলাদা স্থান হয়ে গেল। যে স্থানটি শুধু রক্ষিত ছিল তারই জন্যে। এরপরে যতবারই দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে প্রতিবারই মিশকাতের মনের সে স্থানটি আরও গভীর হয়েছে।

শ্রীনগর থেকে রিকশায় যাচ্ছিলেন সনজিদা খানম, কয়কীর্তনের বটতলার একটু পশ্চিমে দেখা হল মিশকাতের সঙ্গে। রিকশা থামালেন। অনেকদিন পরে তাকে দেখল মিশকাত। প্রথমেই সে আঁতকে উঠল। একি হাল হয়েছে তাঁর। শরীর ভেঙে গেছে, মুখ ফ্যাকাশে, চোখের নীচে কালো দাগ জমা হয়েছে। মিশকাতের প্রশ্নের জবাবে সনজিদা খানম সেদিন জানিয়েছিলেন, তাঁর শরীর অসুস্থ। কিন্তু কোন ডাক্তার রোগ ধরতে না পেরে সঠিক চিকিৎসা করছেন না।

দু'দিন পরে মিশকাত গিয়েছিল আবার দেখতে। কিন্তু বাড়িতে ছিলেন না সনজিদা খানম। তাকে নারায়ণগঞ্জ নিয়ে এসেছে সনজিদা খানমের ভাগ্নে। ঢাকায় ফিরে মিশকাত খোঁজ নিয়ে জেনেছিল তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জ আধুনিক হাসপাতালে। মিশকাত ছুটলো সে হসপিটালে। সনজিদা খানম ধবধবে বিছানায় শুয়ে আছেন। কেউ নেই তার কাছে। মিশকাতকে দেখে উঠে বসলেন তিনি। সেদিন দুই ঘণ্টার মতো থেকেছিল মিশকাত সনজিদা খানমের সঙ্গে, নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছে। তার মনে প্রফুল্লতা বাড়ানোর জন্যে। মিশকাত মুগ্ধ হয়ে যেত সনজিদা খানমের নির্ভুল বাঙলা উচ্চারণে। সে উচ্চারণে ছিল না কোন মেকাপ। অতি সাধারণভাবে শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতেন

সনজিদা খানম।

এরপর তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল ঢাকা মেডিক্যালে। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে। ততদিন তাঁর রোগ নির্ণয় হয়ে গেছে। পেটের ভিতরে টিউমার। সে টিউমার তাঁর শরীরের জীবনীশক্তি আস্তে আস্তে শুষে নিচ্ছে। তাই অপারেশন করে ফেলে দিতে হবে ওভারি থেকে টিউমারটি। কিন্তু অপারেশনের সময় টিউমারটি অপসারণ করতে ব্যর্থ হল ডাক্তার। শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে টিউমারটি। শুধু অংশ বিশেষ কেটে কেটে সি এইচ-এ পাঠালেন বায়োপসি করতে। চারদিন পরে রিপোর্ট এলো বায়োপসির। ক্যান্সার ফরম করেছে। আর ক্যান্সারের অবস্থা এখন স্বাভাবিক নেই। প্রাথমিক অবস্থা ছাড়িয়ে গেছে আরও অনেক আগে। গাইনীর ডাক্তারের উপর মিশকাতের অভিযোগ, তিনি ইচ্ছে করলে, যত্নের সঙ্গে অপারেশন করলে টিউমার অপসারণ করতে পারতেন। রোগী যেহেতু ক্লিনিকের নয়, এমনকি মেডিক্যালের কেবিনেরও না, ওয়ার্ডের মাত্র—তাই করা হয়েছে অবহেলা। এরকম অবহেলার শিকার হচ্ছে প্রতিদিন অসংখ্য রোগী। ডাক্তারদের এই অবহেলার জন্যে নিত্য ঝরে পড়ছে পৃথিবী নামক গাছটি থেকে অনেক মূল্যবান প্রাণ।

একই ওয়ার্ডে রাখা হল তাঁকে। চিকিৎসা চলতে লাগল। অপরেশনের ঘা শুকালে তিনি ফিরে এলেন বাসায়। অসুস্থতা বেড়ে গেলে তাকে ভর্তি করা হল আহসান ক্লিনিকে। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ প্রফেসর হুদা তাঁকে চিকিৎসা করে কিছুটা সুস্থ করে তুলে আবার বাসায় পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে চলতে লাগলো ক্লিনিক থেকে বাসা। আবার ক্লিনিক। সুস্থ তিনি আর কোনদিনই হবেন না একথা মুখে না বললেও অনেকের মতো মিশকাতও জানে। সে সাধ্যমতো সময় দিয়ে যাচ্ছিল মাকে। যতটুকু সম্ভব সেবা করতে কার্পণ্য করে না।

ডাক্তার সিদ্ধান্ত দিলেন রোগীকে রেডিওথেরাপি দেওয়ার। ঢাকা মেডিকেলে যে গাড়িতে চড়ে তিনি যেতেন থেরাপি দিতে সে

গাড়িটি এখন পুলের গ্যারেজে পড়ে আছে অকেজো হয়ে। এই গাড়িটিও কি একদিন হারিয়ে যাবে, মিশে যাবে মাটির সঙ্গে যেমন করে মিশে গেছেন সনজিদা খানম।

রেডিওথেরাপি ক্যান্সারের যন্ত্রণা থেকে তাঁকে কিছুটা উপশম দিলেও শরীর থেকে শুষে নিচ্ছিল জীবনীশক্তি। এমনকি মাথার চুল পর্যন্ত। মাথার দীর্ঘ চুল ঝরে গেলে তাঁকে দেখাচ্ছিল কঙ্কালের আকৃতির। মায়ের এই যন্ত্রণা দেখে বড় কষ্ট হচ্ছিল মিশকাতের। শেষবারের মতো তিনি ভর্তি হলেন আহসান ক্লিনিকে। চার তলার ৪০৭ নম্বর কেবিনে। তাঁকে কৃত্রিম উপায়ে দেওয়া হচ্ছিল জীবনীশক্তি, যা সংগ্রহ করতে হত আইসিসিডিআর বি, রেডক্রস ব্লাড ব্যাংক এবং বিভিন্ন ঔষধের দোকান থেকে। খাওয়া-দাওয়া অনেক আগে থেকেই কমে গিয়েছিল তাঁর। শেষের দিকে কিছুই খেতে পারতেন না। ঝাল, মিষ্টি, টক কোন রকম খাবারই মুখে তোলা সম্ভব ছিল না। প্রচণ্ড রকম যন্ত্রণা হচ্ছিল ভিতরে।

হঠাৎ একদিন বললেন, তালের শাঁস হয়তো খেতে পারবেন। অনেকে বেরিয়ে গেল তালের শাঁসের খোঁজে। কিন্তু এপ্রিলের এই অসময়ে সবাই ব্যর্থ হল। আগামসি লেন, বংশালের মোড়, সদরঘাট, নিউমার্কেট ঢাকা শহরে খুঁজে তন্ন তন্ন করেছে মিশকাত কিন্তু তালের শাঁস পায়নি।

অবশেষে খবর পেয়েছে গাজীপুরে পাওয়া যাবে তালের শাঁস। মিশকাত ছুটেছে গাজীপুরে। গাজীপুর শহরের ফলের দোকানগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে হতাশ হয়েছে। একজন ফলের দোকানী আভাস দিয়েছিল পরের দিন সংগ্রহ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। হতাশ হয়ে ফিরে পরের দিন গাজীপুর যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল মিশকাত।

পরের দিন কি সেই দোকানী তালের শাঁস এনেছিল? এই একটি প্রশ্ন সারাজীবন মিশকাতের কাছে প্রশ্ন হয়েই থাকবে। এই প্রশ্নের যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, খাবে সারা জীবন।

না তালের শাঁস খেতে পারেননি সনজিদা খানম। ত্রিশ পঁচানব্বই গাড়িটি একদিন এল মিশকাতের বাসার কাছে। ড্রাইভার এসে জানাল এই গাড়িতে যিনি অসংখ্য দিন গিয়েছেন ঢাকা মেডিকেলে, আহসান ক্লিনিকে, প্রফেসর হুদার চেম্বারে তিনি আর কোন দিন চড়বেন না ত্রিশ পঁচানব্বই নম্বরের টয়োটা স্টারলেটে। পৃথিবীর কোন যানেই আর কোন দিন চড়বেন না সনজিদা খানম।

দিয়া ঢাকার মেয়ে। ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি নিয়ে পড়ায়। পরিবারে সে আর তার মা ছাড়া আর কেউ নেই। বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন। একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ঠিক দুদিন আগে আল-বদর নর-পশুরা বাবাকে কোয়ার্টার থেকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। রায়ের বাজার বদ্ধভূমি, মীরপুরের বদ্ধভূমি সব খুঁজে বেড়ানো হয়েছে। দিয়ার মা বা তার আত্মীয়-স্বজন কেউই খোঁজার কোন ত্রুটি রাখেন নি, কিন্তু তবুও দিয়ার বাবার লাশটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ এই সব জায়গা থেকে অনেক আত্মীয় পরিজনেরা তাদের আপনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন। কোন শবদেহের চোখে পট্টি বাঁধা, কারও হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, কারো বুকে গুলির চিহ্ন! এই দেশের আল-বদর পাক-জল্লাদেরা গুলির বৃষ্টিতে মানুষের বুকের পাঁজর ঝাঁঝরা করে জীবন হরণ করেছে। যখন বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রায় মুখোমুখি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, এই খবর পাওয়া মাত্র, পাক হানাদার আর তাদের এই দেশের দোসর আল-বদর, আলসামস আর রাজাকারেরা সম্মিলিতভাবে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করা শুরু করে।

একাত্তর সালে দিয়ার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। উনিশে ডিসেম্বর সে চার পূর্ণ করে পাঁচে পা দিচ্ছিল, কিন্তু চোদ্দ তারিখেই বর্বর হানাদারেরা তার বাবাকে তুলে নিয়ে যায়। ষোলই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। সারা দেশ উল্লাসে ফেটে পড়ে। কিন্তু দিয়ার পরিবারে কোন আনন্দ ছিল না। বাবার খোঁজে মা বেরিয়ে পড়েছিলেন। সপ্তাহ খানেকেরও বেশি সময় ধরে খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে আসেন। দিয়ার মা, কাকা, মামা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সবাই নিরাশ হয়ে বসে ছিলেন। শিশু দিয়া

কিন্তু তার বাবার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় ছিল। অন্য দিন না হোক, জন্মদিনের দিন নিশ্চয়ই বাবা ফিরে আসবেন। এমনি প্রত্যাশায় তার পঞ্চম জন্মদিনটিও পার হয়ে গেল। কিন্তু তার বাবা আর ফিরলেন না। সে বছর তার জন্মদিনের কোন উৎসব পালন হল না। কেউ তাকে নতুন জামাকাপড় বা পুতুল কিছুই উপহার দিল না। কেউ তাকে জন্মদিনের কেক মুখে তুলে দিয়ে আদর করল না। দিয়ার খুব মন খারাপ করছিল। বাবার ওপর তার খুব অভিমান হচ্ছিল। পাগলের মতো সে বার বার বাবার খোঁজ করছিল।

পরের বছর যখন তার জন্মদিন এল, মা তার জন্য উৎসবের আয়োজনের ব্যবস্থা করছিলেন।

"না-না মা, বাবা ফিরে এলে তবেই জন্মদিন পালন করবো—"

মায়ের চোখে তখন নোনতা জলের ধারা।

ব্যস, সেদিন থেকেই দিয়ার জন্মদিনের উৎসব বন্ধ হয়ে গেছে। বাবাকে ছাড়া সে কোন জন্মদিন পালন করতে রাজি হয়নি। না, আর কোন জন্মদিন সে উদ্‌যাপন করবে না।

গত ডিসেম্বরে দিয়ার সাঁইত্রিশ বছরের জন্মদিনটিও পার হয়ে গেল। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাবা ফিরে আসেননি।

আর মাত্র মাসখানেক পরেই দিয়ার আটত্রিশতম জন্মদিন আসতে চলেছে। এতদিনে এটা তো বুঝেই ফেলেছে যে বাবা আর কোনদিন ফিরে আসবেন না। তবুও বাবাকে ছাড়া সে জন্মদিন কখনোই পালন করবে না, এটা তো স্থির হয়েই আছে তার পাঁচ বছর বয়স থেকে। ছয় মাসের একটা ফেলোশিপ নিয়ে সে দিল্লি এসেছিল। ফেলোশিপের মেয়াদ জানুয়ারিতে শেষ হবে। এই ফেলোশিপ সে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া স্টাডিস ডিপার্টমেন্ট-এর তরফ থেকে পেয়েছে। তার বিষয় "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের আর্থিক ক্ষতি!" যেহেতু সে অর্থনীতির শিক্ষিকা, তাই সে এমন বিষয়টি বাছাই করেছে।

ইদানিং সবাই জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদালয়কে সম্মানের

সঙ্গে “জে এন ইউ” বলেই ডাকছে।

ছাত্র-শিক্ষকেরা তো এই নামে ডাকতই, এখন বাইরের লোকেরাও এই নামই বলে। কর্তৃপক্ষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে ওর জন্য একটি ঘরের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। সাউথ এশিয়ান স্টাডিস বিভাগের প্রফেসর আই এন মুখার্জী এবং এম পি লামা ওর আগেই পরিচিত ছিলেন। ঢাকার বিভিন্ন সেমিনারে এঁদের যাতায়াত ছিল। ওনারা দুজনেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ-বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। দিয়ার সঙ্গে এঁদের ঢাকাতেই পরিচয় হয়। এই বিভাগের একজন রিসার্চ স্কলারও তার থিসিসের ফিল্ড-ওয়ার্কের জন্য ঢাকায় গিয়েছিল। তখন দিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তার নাম নলিন ভারতী সিনহা। নলিনের থিসিসও ছিল বাংলাদেশ ও ভারত-সম্পর্কিত। থিসিসের শিরোনামটি ছিল বেশ দীর্ঘ—‘ইসুজ ইন প্রাইভেটাইজেশন, এ কেস স্টাডি অফ ... অফ... ইন বাংলাদেশ”। নলিন বিহারের ছেলে! বেশ মিশুক, অতিথি-পরায়ণ এবং অন্তরঙ্গ। জে এন ইউ-তে নলিনের মাধ্যমেই আর সবার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ও যে গেস্ট হাউসে থাকে তার জানলা খুললেই সকাল সন্ধ্যে ময়ূরের ঠমক চাল চোখে পড়ে। শুরুতে বড় আগ্রহ নিয়ে সে ময়ূরের দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু গাছের ডালে বসে যখন তীব্রস্বরে ডাকতো তার কানে সেটা ভীষণ কর্কশ শোনাতো। এত সুন্দর একটা পাখির আওয়াজ এত কর্কশ, আর কানে তা এতটা তিক্ত লাগতে পারে সেটা তার কল্পনাতেও ছিল না। ঢাকার চিড়িয়াখানা ছাড়া সে এর আগে ময়ূর আর কোথাও দেখেনি। এর আগে সে দিল্লিতেও আসেনি। এখানে নলিনই তাকে তার প্রয়োজনীয় জায়গাগুলি ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। এখন সে একাই প্রয়োজন মতো সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারে। ওর প্রয়োজনীয় জায়গা হল—লাইব্রেরি, আর্কাইভ, সরকারী দপ্তর আর বিশেষ বিশেষ লোকেদের বাড়ি কিংবা অফিস। এমনিতেও, দিল্লির মতো শহরে, কারও ঠিকানা খুঁজে নিতে ওর কোন অসুবিধা হয় না। তা সে যে কোন শহরেই

হোক, কোন ঠিকানা খুঁজে নিতে সেখানকার ট্যাক্সি-ড্রাইভার কিংবা অটোচালকেরাই বেশি সহায়ক হয়। দিল্লিতে অটো করে চলতেই ওর বেশি সুবিধা হয়। দিল্লি তো অটোরই শহর, যেমন কলকাতা ট্যাক্সির শহর।

দিয়া আজ ইন্ডিয়া গেটের নিচে সেই ঐতিহাসিক জায়গা দেখতে গিয়েছিল। স্মৃতি-সৌধ! ভারত সরকার দিল্লির অন্যতম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করিয়েছে। দিল্লিতে আসার আগে এ সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। নলিন ভারতীই ওকে প্রথম খবর দেয়। কাল সন্ধ্যায়, গঙ্গা ধাবায় যখন নলিনের সঙ্গে চা খাচ্ছিল, তখনই সে তাকে এই স্মৃতি-সৌধের কথা বলে। গঙ্গা ধাবা তো জে এন ইউ-এর ছাত্র-ছাত্রীদের একটি প্রাণকেন্দ্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধু-র ক্যান্টিনের মতো। মধু-র ক্যান্টিনে কোনদিন কোন ভালো চেয়ার টেবিল ছিল না, আজও নেই। হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে বসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বহু আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরশাসক এরশাদকে সরানোর জন্য সংগ্রাম-এর মতো অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সূত্রপাত এই মধু-র ক্যান্টিন থেকেই হয়েছিল। আজকের বাংলাদেশে যত জাতীয় নেতা রয়েছে, আর যাদের ছাত্র জীবন কেটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাদের প্রায় সকলের কাছেই এই মধুসূদন দে-র টাকা পাওনা আছে। মধুদা বিক্রমপুরের শ্রীনগর থেকে ঢাকায় এসেছিলেন আর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক হয়ে গিয়েছিলেন। মালিক? হ্যাঁ, এটাই সত্যি। মুক্তিযুদ্ধের আগে, ঢাকা শহরে পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলনের নামে যত সভা-সমিতি হত, সেখানে ছাত্র নেতারা, মধুসূদন দে-কে হাজির করত। লুঙ্গি-ফতুয়াধারী এই মানুষটিকে বিশাল জনসমুদ্রের সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক হিসেবে পরিচয় করাতো ছাত্র নেতারা। মধুদা আর তার ক্যান্টিন, তখনকার আন্দোলনে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য কতটা মূল্যবান ছিল, সে কথা পাকিস্তানিদের

বুঝতে বেশি দেরি হয়নি। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা এবং বাংলাদেশের নিরীহ, অসহায়, স্বাধীনতাকামী বাঙালির ওপর যে হত্যা লীলা চালিয়েছিল, তাতে যারা অন্যতম লক্ষ্য ছিল, তাদের মধ্যে একটি নাম মধুসূদন দে! সেই রাতে প্রথম পর্বেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মধুদা-কে তার ঘর থেকে টেনে বার করে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। উল্লেখ্য, মধুর ক্যান্টিন আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান। ফৌজি শাসনের আমলে এই মধু ক্যান্টিন বহুবার রক্তস্নাত হয়েছে। বেআইনী অস্ত্রধারী ছাত্রদের হাতে নিরীহ ছাত্ররা শহিদ হয়েছে। মধুর ক্যান্টিন-এ এই কলঙ্কময় রক্তের দাগ-ছাপ লাগিয়েছে, জিয়া আর এরশাদ নামক দুই সেনা শাসক, যারা ছাত্র আর সাধারণ মানুষের পিছনে সশস্ত্র ক্যাডারদের লাগিয়ে দিয়েছিল।

জে এন ইউ-এর এই গঙ্গা ধাবা কি কখনও রক্তস্নাত হয়েছে? দিয়ার সেটা জানা নেই। কিন্তু এই গঙ্গা ধাবাতেই সে এক পাগলের দেখা পেয়েছে। পরে সে নলিনের কাছে তার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে। সত্তরের দশকে যখন ভারতে ইমাজেন্সি হয়েছিল তখন বহু সচেতন মানুষ তার বিরোধিতা করেছিল। এই পাগলও সেদিন জে এন ইউ-এর এক মেধাবী ছাত্র ছিল। বিবেকের তাড়নায় সে-ও সেদিন প্রতিবাদ করেছিল। রাজস্থানের কোন এক দরিদ্র পরিবারের এই মেধাবি ছাত্রটিকে ইমার্জেন্সির বিরোধিতা করার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং তাকে অপরাধী ঘোষণা করা হয়। এই বহিষ্কারের নোটিশ পাবার পরে তার মাথার ভারসাম্য নষ্ট হয়। ব্যাস, তখন থেকেই সে পাগল হয়ে যায়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পিতার নামে এই জে এন ইউ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উদার হস্তে বহু অনুদান দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই ক্যাম্পাসে জওহরলাল নেহরু যতটা জনপ্রিয়, এর প্রতিষ্ঠাতা ইন্দিরা গান্ধী নিজেও কিন্তু ততটা জনপ্রিয় নন। নলিন একদিন দিয়াকে বলছিল, এই ক্যাম্পাসে ভারতে যত প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁদের তালিকায় ইন্দিরা গান্ধীর নাম নিচের দিক থেকে সর্ব প্রথম।

জে এন ইউ ইন্দিরা গান্ধীর ইমার্জেন্সিকে আজও ভুলতে পারেনি। তা ছাড়া, ইন্দিরা গান্ধী নিজেও কি তাঁর জীবনের এই কালো অধ্যায়টিকে কখনও ভুলতে পেরেছিলেন? নিশ্চয়ই নয়। দিয়াও তাই মনে করে যে, তাঁর মতো একজন গণতন্ত্রপ্রিয় রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে সেটা ভোলা সম্ভবও নয়।

ইন্ডিয়া গেটের কাছে যে স্মৃতি-সৌধ সে দেখতে গিয়েছিল তার নাম—'অমর জওয়ান'। বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামে পাকিস্তানিদের হাতে শহিদ হওয়া এক ভারতীয় সৈনিকের হেলমেট আর রাইফেল দিয়ে স্থাপন করে এই মেমোরিয়াল তৈরি করা হয়েছে। এই বীর সেনানী যশোরে শহিদ হয়েছিলেন। বাংলাদেশের মাটিতেই এই শহিদদের রক্ত মিশে আছে। তিন হাজার ছয়শ ত্রিশ জন ভারতীয় শহিদের রক্ত। এ ছাড়াও আরও দু'শ তেরো জন সৈনিকের কোন খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি, সরকারী ভাষায় যাদের "মিসিং" বলা হয়েছে। এঁরাও শহিদ হয়ে গেছেন। বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামে জখম হয়েছেন আরও ন হাজার আটশ ছাপ্পান্ন জন ভারতীয় সৈনিক। এঁদের সম্মান ও স্মৃতিতে বাংলাদেশে কোন সমাধিস্থল নেই। কেউ, কোথাও কোন একটা ইঁটও গাঁথেন নি। এইসব মনে হতেই দিয়ার মাথা লজ্জায় নিচু হয়ে আসে। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে দিয়া এই কৃতঘ্নতাকে মেনেও নিতে পারছে না। নিজের চোখে নিজেকেই বড় ছোট মনে হয়। বাংলাদেশকে স্বাধীনতা পাইয়ে দেবার ক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকদের আত্মত্যাগ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে সুস্পষ্ট স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা নিতান্ত জরুরী, আর এই স্বীকৃতি বাংলাদেশের নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই লিখে রাখা দরকার।

এই সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে দিয়া রাতের খাবার কথা ভুলেই গেছে। হঠাৎ দরজায় কারও আওয়াজ শুনে দিয়া বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খোলে। সামনে মিঠু দাঁড়িয়ে। মিঠুর বাড়ি উড়িষ্যায়। ও আরাবল্লী গেস্ট হাউসে কাজ করে। ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে কোন ক্যান্টিন নেই, কিন্তু জুতসই একটা ডাইনিংরুমের

ব্যবস্থা অবশ্যই আছে। অর্ডার দিলে আরাবল্লীর কিচেন থেকে এখানে খাবার পৌঁছে যায়। মিঠুর বাড়ি উড়িষ্যায় হলেও ও বাংলা ভালোই বলে। বয়-বেয়ারাদের মধ্যে একমাত্র এ-ই বাংলা জানে। বেয়ারাদের সঙ্গে কথা বলতে মিঠুর বেশ অসুবিধা হয়, কারণ ওরা হিন্দি ছাড়া ওন্য কোন ভাষা বোঝে না। আর দিয়াও বাংলা আর ইংরাজি ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেও না, বোঝেও না। দিল্লিতে হিন্দি না জানলে কম বেশি কিছু অসুবিধা তো হবেই। দিয়ারও সেই অসুবিধাই হচ্ছে।

মিঠু জানতে চাইল, রাতে কি খাবেন?

দিয়া খাবার অর্ডার দিয়ে দরজা বন্ধ করার পর ওর মনে হলো, মিঠু বোধহয় ওকে কিছু বলতে চাইছিল।

মিঠু যখন খাবার নিয়ে এল, তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করল— "তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাইছিলে?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম"—মৃদু স্বরে সে জবাব দিল।

"তা, বলো না!"

"বলছিলাম কি ম্যাডাম, আপনি তো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর কাজ করার জন্যই ভারতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, তাই, কি বল?"

"আমি বলছিলাম কি, আমাদের ক্যান্টিনে হরিয়ানার একটা লোক কাজ করে। ওদের গ্রামেরই এগার জন লোক বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে শহিদ হয়েছে।"

"আচ্ছা, কি নাম সেই ছেলেটির?"—উপযাচক হয়ে জিজ্ঞাসা করে সে।

"বিদ্যার্থী!"

"হরিয়ানার কোথায় ওর ঘর?"

"গুরগাঁও-এর খুব কাছেই!"

"খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটে গেলে, ওই ছেলেটিকে একবার এখানে নিয়ে আসতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই, সে তো আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যই অপেক্ষা

করছে।"

"আমি ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলব। ও কি ইংরাজি কিংবা তোমার মতো বাংলা বলতে পারে?"

"না ম্যাডাম।"

"তা হলে ওর সঙ্গে কথা কী করে হবে? আমি তো হিন্দি জানি না!"

"আমি ওর কথা, বাংলায় আপনাকে বুঝিয়ে দেব।"

"গুড আইডিয়া, যাও, ওকে তুমি নিয়ে এসো।"

মিঠু চলে যাবার পর দিয়া খেতে বসলো। আজ সে ডাইনিং হলে না গিয়ে, নিজের ঘরেই খেতে বসলো। খাওয়া-দাওয়া সেরে, সে দরজাটা খুলেই রাখল।

দরজা খোলা দেখে মিঠু ঘরে ঢুকে পড়লো। সঙ্গে সেই বিদ্যার্থী ছেলেটি। ঐ ছেলেটিকে দিয়া আগে কখনও দেখে নি তা নয়। দেখা তো হয়েছে, কিন্তু কথা কখনও হয়নি।

"তোমার নাম কি বিদ্যার্থী?"—ওকে জিজ্ঞাসা করল।

"জি ম্যাডাম!"

"মিঠু বলছিল, তোমার গ্রামের কয়েকজন লোক নাকি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন?"

"জি ম্যাডাম, এগারজন! তাদের মধ্যে আমার কাকাও ছিলেন—।"

"আচ্ছা? কি নাম ছিল তোমার কাকার?"

"করতার সিং!"

"উনি কি সেনা বাহিনীতে ছিলেন?"

"জি, ম্যাডাম!"

"শোনো, তোমাদের গ্রাম এখান থেকে কতটা দূর?"

"এই ধরুন, পঞ্চাশ বাহান্ন কিলোমিটার! গুরগাঁও জেলার মধ্যেই! থানা সোহনা, আর আমাদের গ্রামের নাম দমদমা!"

"তুমি আমাকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে যেতে পারবে?"

"আপনি যাবেন, ম্যাডাম?"

"হ্যাঁ, যাবো তো!"

দিয়া এই প্রথম কোন ভারতীয় শহিদ পরিবারের সঙ্গে কথা বলছিল। ভিতরে ভিতরে বেশ একটা উত্তেজনা আর আকর্ষণ অনুভব করছিল সে। সেই মুহূর্তে সে ঠিক করে ফেলল, কাল বাদে পরশু রবিবার। বিদ্যার্থীরও ছুটি আছে, সেইদিন সে দমদমা গ্রামে যাবে! মিঠুকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে! ওর ভাষাগত সমস্যাও দূর হয়ে যাবে। আজ বিদ্যার্থীর কথা বুঝতে মিঠু যেভাবে সাহায্য করেছে, তাতে দোভাষীর কাজ যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরী সেটা সে খুব বুঝে গেছে। এর আগে কখনও সে এমন অবস্থায় পড়েনি। বোঝা-না-বোঝার এমন পরিস্থিতির মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কখনও তাকে পড়তে হয় নি। যখনই প্রয়োজন হয়েছে ইংরাজির সাহায্যে নিজের কাজ উদ্ধার করেছে সে। কিন্তু বাংলা ভাষায় নিজের মনের ভাব যতখানি প্রকাশ করা সহজ, ইংরাজিতে কি তা হয়? না, কখনও তা সম্ভব নয়। অন্যের ব্যাপারে না জানলেও, নিজের ক্ষেত্রে সে এটা খুব অনুভব করেছে। দিয়া এটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের মাতৃভাষায় যতটা সহজ ভাবে কথা বলতে পারে, মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, সেটা অন্য কোন ভাষাতেই সম্ভব নয়।

কোন শহিদ পরিবারের সঙ্গে এটাই তার প্রথম সাক্ষাৎকার। এ ছাড়া, ভারতীয় সেনা বাহিনীর এক আহত সৈনিকের সঙ্গে এর আগে তার দেখা হয়েছে। এখন খেলগাঁও এলাকার ছোটা সিং ব্লকের বাড়িতে থাকেন তিনি। পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক এক প্রাণবন্ত মানুষ। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় তাঁর বয়স ছিল একুশ কি বাইশ। মনোবল ও আত্মবিশ্বাসী এই জওয়ান, মোহন কুমার, ভৈরব সেতুর কাছে পাকিস্তানী হামলাকারীদের গ্রেনেড হামলার শিকার হন। ওঁর বাঁপায়ের হাঁটুর নিচের অংশ উড়ে গেছে, গায়ের চামড়া উঠে গিয়ে সারা শরীরে রক্তের ধারা বইছিল। এই সব ভারতীয় সৈনিকদের রক্তে বাংলাদেশের মাটি ভিজে যাচ্ছিল। সেই রক্ত প্রবাহে ভৈরব নদীর জল লাল হয়ে গিয়েছিল। সেই

রক্তের দাগ আজও মোছেনি। কোনদিন মুছবেও না। যতদিন স্বাধীন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন এই রক্তের রঙ কখনো ফিকে হবে না। প্রকৃত সত্য তো এটাই যে বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা, এই রকম অসংখ্য বাংলাদেশী ও ভারতীয় মানুষের রক্তের ফসল। অবচেতন মোহন কুমারকে যদি তার সহযোদ্ধা হেলিক্যাপ্টারে করে আগরতলা নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি না করাতো, তা হলে শুধু তার রক্ত নয় গোটা দেহটাই বাংলাদেশের মাটিতে মিশে যেত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহিদের তালিকায় আরেকটি ভারতীয় নাম যুক্ত হত।

এরপর মোহন কুমার আর কখনও বাংলাদেশ যাননি। বাংলাদেশও তাঁকে কখনও আহ্বান জানায়নি, না আমন্ত্রণ। যাই হোক, সেজন্য তাঁর কোন খেদও নেই। কিন্তু তিনি যখন দিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর গলায় যে আবেগ মেশানো ছিল, সেটা কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে। এই আবেগ দিয়াকেও অভিভূত করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের এক নাগরিক হিসেবে, এই বীর সৈনিকের সামনে নিজেকে নিজের কাছে খুব ছোট মনে হচ্ছিল।

মোহন কুমার-এর কষ্ট কমানোর জন্য না হোক, নিজের দায়িত্ববোধ থেকেই, দিয়ার মনে হচ্ছিল, তাঁকে সব ঘটনা বলে দেওয়া দরকার। যদিও এই সমস্ত ঘটনা আজকাল পত্র-পত্রিকায় 'খবর' হিসেবে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। হ্যাঁ, অভাব আর অনটনের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এক মুক্তিযোদ্ধা বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কোন উপযুক্ত চাকরি না পেয়ে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এই রকম অসংখ্য ঘটনা ঢাকা শহরেও ঘটেছে। কাজকর্ম না পেয়ে অগণিত মুক্তিযোদ্ধা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। বাংলাদেশের জনজীবনে এমন ঘটনা এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। শুরুতে মানুষের মনে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে, কিন্তু এখন আর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

মতিঝিল এলাকায় কোন বহুতল বাড়িতে, দিয়া কারও সঙ্গে

দেখা করতে গিয়েছিল। লিফ্‌টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লিফ্‌টম্যান তড়িঘড়ি টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। অন্য কোন সময় হলে, সে তাকে মানা করত না। টুল থেকে উঠতে গিয়ে তার খুব অসুবিধা হচ্ছিল। ঐ লিফ্‌টম্যানের পিঠে কুঁজের মতো কিছু একটা হয়েছে। টুলের ওপরেও সে স্বাভাবিকভাবে বসতে পারছিল না। দিয়া ছাড়া, লিফ্‌টে আর অন্য কোন আরোহী ছিল না। ওর এগার তলায় যাবার কথা। দিয়া লক্ষ্য করেছে, ঐ লিফ্‌টম্যান হাঁপাচ্ছিল। লিফ্‌ট যত ওপরে উঠছিল তাঁর হাঁপ তত বাড়ছিল। দিয়া ছ তলায় লিফ্‌ট থামাতে বলল। ওই লোকটির এত শ্বাসকষ্ট দেখে, তার নিজেরই খুব খারাপ লাগছিল। কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সাত তলায় গিয়ে লিফ্‌ট আবার থামল।

দিয়া লিফ্‌টম্যানকে বলল, 'আমি লক্ষ্য করেছি, ওপরে ওঠার সময় আপনার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।"—লিফ্‌টম্যান জবাব দিল।

"আপনাকে তো দিনভর কয়েকশ বার ওঠানামা করতে হয়।"

"কী আর উপায় আছে, বলুন ম্যাডাম।"

"এই চাকরি ছেড়ে, অন্য কিছু করছেন না কেন?"

"নতুন চাকরি কে দেবে? মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম, তখন হানাদার বাহিনীর গুলি পিঠে এসে লাগে। অপারেশন করে ডাক্তাররা সব গুলি বের করতে পারেনি। সেই গুলিই আমাকে এখন যন্ত্রণা দিচ্ছে, আর সেটাই আমাকে কুঁজো বানিয়ে দিয়েছে। জানি না শ্বাস নিতেও কেন এত কষ্ট হয়!"

"আপনি কি একজন মুক্তিযোদ্ধা?"

"হ্যাঁ, ছিলাম তো বটে, কিন্তু এখন সে পরিচয় দিতেও ভয় লাগে।"

"কেন?"

"এর জবাব তো আপনিই আমার থেকে ভালো জানেন, আমার পক্ষে তো সেটা আরও অসুবিধাজনক।"

"কিসের অসুবিধা?"

"এই যে বাড়িটা দেখছেন, আমি এর লিফ্‌টম্যান। আর এর মালিক কে, জানেন?"

"না তো!"

"মাওলানা শফিকুল ইসলাম। একাত্তরের কুখ্যাত রাজাকার।"

দিয়া এর পর আর কোন প্রশ্ন করতে পারেনি। এরপর আর কিছু জিজ্ঞাসা করা সম্ভব ছিল না। সে তার ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে, লিফটম্যানের হাতে দিয়ে তাকে নিজের অফিসে দেখা করতে বলল। নিজের চোখের জল গোপন করতে সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল।

মোহন কুমারকে এই লিফট্‌ম্যানের ঘটনা বলতে গিয়ে দিয়া লক্ষ্য করেছে, সৈনিক জীবনে অভ্যস্ত মোহন কুমারের চোখের কোণেও অশ্রুর ফোঁটা ঝিলমিলিয়ে উঠেছিল।

প্রাতরাশ শেষ করে, দিয়া বিদ্যার্থীর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। ওর দোভাষী মিঠু, ড্রাইভারের পাশে বসেছিল। বিদ্যার্থীকে দিয়া নিজের কাছে ডান দিকে বসিয়ে নিল। গুরগাঁও পর্যন্ত ড্রাইভার একবারও মুখ খোলেনি। চৌরাস্তার কাছে এসে সে জানতে লাগল। দমদমাকে ঠিক গ্রাম কিংবা শহর কোনটাই বলা যায় না। এই জায়গা, একাত্তর সালে পুরোপুরি গ্রামই ছিল, যখন এখানকার এগারজন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন।

বিদ্যার্থী দিয়াকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে নিজের ঘরে সাদরে বসতে দিল। কাঁসার থালার ওপর বসিয়ে স্টিলের গ্লাসে সে জল নিয়ে এল। অতিথিকে প্রথমে জল দেওয়া এখানকার স্বাভাবিক প্রথা। দিয়ার জল পিপাসা না পেলেও সে গ্লাস হাতে তুলে নিল। এক চুমুক জল সে পানও করল। এই জলের স্বাদ দিল্লির জলের চেয়ে আলাদা। এই জল সোজাসুজি টিউবওয়েল থেকে তুলে আনা। এটা পাইপের সাপ্লাই করা হয়। এই স্বাদ, শহরের জলে পাওয়া যায় না। শহরের জল তো কয়েকদিনের বাসি তরকারির মতো।

বিদ্যার্থীর বাড়ির পাশেই তার কাকার বাড়ি। পৈত্রিক পরম্পরায়

এটা একই বাড়ি ছিল, পরে দেয়াল তুলে পৃথক করা হয়েছে। বিদ্যার্থী তার কাকিকে দিয়ার কাছে নিয়ে এল। ওই ভদ্রমহিলাকে দেখে দিয়ার মনে একটা আবেগ জেগে উঠল। এর আগে সে কখনও কোন ভারতীয় শহিদের স্ত্রীকে দেখেনি।

কথা শুরু করার আগে দিয়া নিজেই তার পরিচয় দিল—"আমি দিয়া মির্জা, বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বিদ্যার্থীর মুখে আপনাদের কথা অনেক শুনেছি, তাই দেখা করতে এলাম।"

সে হাত জোড় করে বিদ্যার্থীর কাকিমাকে নমস্কার করল।

বিদ্যার্থীর কাকিমার নাম নীলম। একাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে তার বিয়ে হয়েছিল। নীলমের স্বামী যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে যায়, তখন নীলম সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। যুদ্ধে যাবার তের দিনের মধ্যেই খবর আসে যে তার স্বামী শহিদ হয়ে গেছেন। স্বামীর শহিদ হবার খবর পেয়ে নীলম অজ্ঞান হয়ে যায়। তারা এটাও জানতে পারে যে মৃতদেহ দমদমায় নিয়ে আসা যাবে না। কিন্তু সরকারের দিক থেকে যতটা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তাতে, নীলম, সেজন্য ভারত সরকারের কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। ওই সময় সেই সাহায্যটুকু না পেলে সে তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারত না। ছেলে যখন পাশ করে বেরোল, ভারত সরকার তাকে একটা চাকরিও দিয়েছিল। নীলমের দুঃখ একটাই যে, ছেলে নিজের বাপকে দেখতে পেল না। ওর বাপের কথা বলতে গিয়ে নীলমের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

দিয়া দমদমার এগারজন শহিদের সবার বাড়িতে গিয়ে তাদের সকলের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে। সে শহিদদের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে বেশি উৎসুক ছিল। দমদমা থেকে ফেরার সময় বিদ্যার্থী তার সঙ্গে ফেরেনি। সে তার বাড়িতেই থেকে গেছে। আগের মতো মিঠু গিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল। দিয়া একলাই পিছনের সিটে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল। গুরগাঁও পেছনে রেখে ওরা দিল্লির দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু রাস্তার দু-পাশের কোন দৃশ্যই দিয়ার চোখে পড়ছিল না। কোন দৃশ্যই

তাকে স্পর্শ করছিল না। দিয়ার দৃষ্টি গাড়ির কাচের বাইরে পড়ে ছিল মাত্র। সে সত্যবীর সিং-এর চিন্তায় মগ্ন ছিল।

সে সত্যবীর সিং-এর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। আরেকটি বিয়ে করে সে অন্য কোথাও সংসার পেতেছে। বিয়ের ষোল দিন পরেই সত্যবীরকে আগরতলা চলে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে আখাউড়া। সেখানেই সত্যবীর শহিদ হন। সত্যবীরের বাবার সঙ্গে দিয়ার কথা হয়েছে। তিনি স্কুল শিক্ষক ছিলেন। এখন রিটায়ার্ড! বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।

সত্যবীর যখন শহীদ হয়, তখন সে ভারতীয় সেনা বাহিনীতে মেজর ছিল। তার মৃতদেহ যখন বাড়িতে আনা হয়েছিল, তখন চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। সত্যবীরের শবদেহ নিয়ে সেনাবাহিনীর কয়েকজন এসেছিল, তার মধ্যে একজন ছিল তার সঙ্গী। সে-ই সত্যবীরের বাবার কাছে সব ঘটনা জানায়। কোন কারণে, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা না পড়ে যায়, সেজন্য সে মাথায় টুপি পড়ে থাকত। কখনও লুঙ্গি-গেঞ্জি পড়ে চাষার মতো ঘুরে বেড়াত। সত্যবীর সেনা বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের মেজর ছিল। সে কেবল পোশাক আর বেশভূষাতেই নিজেকে যে বদলে নিয়েছিল তাই নয়, নিজের শরীরের গোপনাঙ্গেও অপারেশন করিয়ে নিয়ে ছিল।

সত্যবীরের বাবার কাছে এই কথা শুনে দিয়া স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। আমরা, বাংলাদেশের মানুষেরা কি সত্যবীরের এই আত্মত্যাগের কথা কখন মনে রেখেছি? তার এই মহান ত্যাগের কথা, বাংলাদেশের চৌদ্দকোটি জনতার মধ্যে চৌদ্দজনও কি এর খবর রাখে? না, কেউ জানে না। দিয়াও যদি দমদমায় না আসত, তাহলে সে নিজেও কি এই মহান ভারতীয় সেনার কথা জানতে পারত? অজান্তেই দিয়ার হাত ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ঈশ্বরের কাছে দমদমা গ্রামের শহিদের জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে শহিদ হয়েছেন, সেই সকল সৈনিকের জন্য দিয়া নিজের শ্রদ্ধা অর্পণ করল।

গঙ্গা ধাবা

পুলকের মন বড় উদাস হয়ে আছে।

কেন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা, পরিচয় হয়েছিল, তখন সে যে কতটা আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিল সেটা ভেবে নিজেকে বড্ড ছোট মনে হচ্ছিল। নিজেকে ছোট মনে করার কারণ এটা নয় যে ওর দুঃখ খুব কমে গিয়েছিল অথবা সমস্যা একেবারে দূর হয়ে গিয়েছিল। না, এমনটা নয়, বরং নিজের কাছে নিজেকে নির্লজ্জ মনে হচ্ছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে এতটা আবেগপ্রবণ না হলেই ভালো হত। কিন্তু কি করবে? মনের কোন কোন আবেগকে অনেক সময় সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু সব সময় তো আর সেটা যায় না। এমনও হয় যে আবেগই মানুষকে চালিত করে।

আজ পুলকের এমনটাই ঘটেছে। সে বিছানায় শুয়ে কোন্ খেয়ালে ডুবে ছিল কে জানে। তখন ঘরে কেউ ছিল না। রিসার্চ স্কলার হিসেবে নিয়মমতো ওকে সিঙ্গল কামরাই দেওয়া হয়েছিল। এখন তার থিসিসটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। থিসিস জমা করার পর আর বড়জোর মাসখানেক সে এই ঘরে থাকতে পারবে। তারপর, ঝিলম হোস্টেলের এই কামরা তাকে ছেড়ে দিতেই হবে। শুধু তাদের এই হোস্টেলই নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হোস্টেলের নামই কোন না কোন নদীর নামে করা হয়েছে। এরপর সে কোথায় থাকবে সেটা অবশ্য এখনো ঠিক করে উঠতে পারেনি। দিল্লিতে ওর কোন নিকট আত্মীয়ও নেই। দিল্লিতে থাকতে হলে তাকে কোথাও কোন ঘর ভাড়া করে থাকতে হবে। কিন্তু দিল্লিতে ঘর ভাড়া এত বেশি যে ওর পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। ওর

নিজের বিশেষ কোন উপার্জনও নেই। একটা গার্লস কলেজে পার্ট টাইম লেকচার দিয়ে যা পায় তাতে কোন রকমে চলে যায়।

এতদিন তো বাড়ি থেকে টাকা এনে দিন চলত। কিন্তু এখন সেটা তার কাছে লজ্জা লাগে। গত তিন বছর ধরে সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে আর সব সময়েই বাড়ি থেকে টাকা এনে চলেছে। কলেজে পার্ট টাইম কাজটা পাবার পর নিজেই বাড়ির লোককে মানা করে দিয়েছে টাকা পাঠাতে। কোন ভালো কাজের প্রত্যাশায় একের পর এক ইন্টারভিউ দিয়ে চলেছে। কিন্তু এখনও কোন কাজ পাওয়া যায়নি। পুলকের তেমন কোন নিকট আত্মীয়ের ব্যাকিং নেই, সেইজন্যই কি তার চাকরি হচ্ছে না? হয়তো বা তাই।

এই সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই চায়ের তেষ্টা পেয়ে যায় ওর। চা খেতে হলে তো এখন গঙ্গা ধাবা পর্যন্ত যেতে হবে। গঙ্গা ধাবা! সেটা তো লেডিস হোস্টেলের গায়ে লাগানো ধাবা। যেহেতু ওই হোস্টেলটির নাম "গঙ্গা", সেই জন্য ধাবার নামের সঙ্গে গঙ্গা শব্দ জুড়ে গিয়ে ওর নাম হয়েছে "গঙ্গা ধাবা"। এখানে সন্ধ্যা হয় রাত বারটার সময়। গঙ্গা ধাবার চায়ের দোকান খোলা থাকে রাত তিনটে পর্যন্ত। এখানে লোকজন শুধু চা খেতে বা পান সিগারেটের জন্য আসে না। বহু ছাত্রছাত্রী রাতের খাবারও এখানে সারতে আসে। গঙ্গা ধাবায় অনেকের সঙ্গে দেখা হবে এবং গল্প করে মনটাও ঠিক হয়ে যাবে, এইসব ভেবে শুধু চায়ের আকর্ষণে নয়, লোকজনের টানে নিজের ঘরে তালা লাগিয়ে গঙ্গা ধাবার উদ্দেশে পা বাড়ালো সে।

ঝিলম হোস্টেলের পেছনের খালি জায়গাটা ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা। সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা যমুনা হোস্টেল পর্যন্ত চলে গেছে। দিনের বেলায় এই রাস্তায় ময়ূর ঘোরাফেরা করতে

দেখা যায়, কখনো আবার ডালে বসে আওয়াজ করতে থাকে। এত সুন্দর দেখতে প্রাণীর আওয়াজ কেন এত রুক্ষ আর কর্কশ, সেটা পুলক ভেবে পায় না। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন সবাই জে এন ইউ নামেই ডাকে। উনসত্তর সালে ইন্দিরা গান্ধীর প্রচেষ্টায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দিল্লি শহরের বর্তমান পরিসরের মধ্যেই আরাবল্লী পাহাড়ের গায়ে সতের শ একর জমির ওপর এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল। ময়ূর এখানে প্রথম থেকেই ছিল। আজও ঘুরতে ফিরতে দেখা যায়। অগণিত ময়ূর যেখানে, সেখানে অগণিত সাপ থাকবে না সেটা কে বলতে পারে। পুলক নিজেও তো দু দিন সাপের সামনে পড়ে গিয়েছিল।

ঝিলম হোস্টেল থেকে যমুনা হোস্টেলে যাবার যে রাস্তা, সেখানে এক গাছের তলায় বন্দুক হাতে বিহারী পাহারাওয়ালা বসে থাকে। যমুনা হোস্টেলের সুরক্ষার জন্য ঐ পাহারাওয়ালার হাতে বন্দুক দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জে এন ইউ-তে সর্বমোট তিনশ গার্ড রয়েছে। কিন্তু তাদের সবার হাতে বন্দুক নেই, মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাহারাদারকে বন্দুকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যে সব পাহারাদার লেডিস হোস্টেলের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কেবল তাদের হাতেই বন্দুক থাকে। যমুনা হোস্টেলের গেটে এই বিহারী বন্দুকধারী পাহারাদার সারারাত কাটিয়ে দেয়। ওর হাতে কেবল একটি বন্দুক আর একটি টর্চ লাইট থাকে। লোকটি বেশ সদা হাস্যময়। ওর ঐ হাসিখুশি থাকার কারণটা যতটা স্বভাবগত, তার চেয়ে বেশি গাঁজায় নেশাগ্রস্ত থাকার দরুন। দিনের বেলায় কখনও ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে পুলকের ওকে তেমন হাসিখুশি মনে হয়নি। হ্যাঁ, এই রাস্তার ওপরেই দু-দুবার ওকে সাপের সামনে পড়তে হয়েছিল।

অনন্যা যমুনা হোস্টেলেই থাকে। তাকেও ডেকে নিয়ে যাবে

কিনা, ঝিলম হোস্টেলের গেটে দাঁড়িয়ে সসংকোচে একবার চিন্তা করল সে। নিজের হাত ঘড়িতে দেখলো একটা বেজে দশ মিনিট হয়েছে। এতক্ষণে হয়তো সে শুয়েই পড়েছে। কাল তো ওর আবার দিল্লির বাইরে যাবার কথা, নইলে নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে যেতে পারত। তবুও পুলক নিজের মোবাইল থেকে ওর নম্বরে একবার চেষ্টা করল। অনন্যার মোবাইলের সুইচ অফ। ও নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত পুলক একাই গঙ্গা ধাবার উদ্দেশ্যে রওনা হল।

এমনিতে গঙ্গা ধাবা তেমন কোন গোছানো, পরিপাটি জায়গা নয়। তবুও এই জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র-ছাত্রীদের নেশার মতো টানে। নিজের ঘরে যে মেয়ে চায়ের স্বাদের উনিশ বিশ হলে মুখে তুলত না, সে-ও এখানে নিজের বয় ফ্রেন্ডের গায়ে গা লাগিয়ে বসে শত বিস্বাদের কড়া চায়েও পরম তৃপ্তিতে চুমুক দিতে থাকে। গঙ্গা ধাবা চাঁদের মতো গোলাকার একটি জায়গা। এখানে বিভিন্ন জায়গায় কিছু পাথর বিচ্ছিন্ন ভাবে রাখা হয়েছে যার ওপর বসে সব বিদ্যার্থীরা চায়ের স্বাদ উপভোগ করে। গল্প করে। কখনো প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের আবেগ ভালোবাসার চিহ্ন রাখে একে অপরের ঠোঁটে। কারো অন্যের দিকে নজর দেবার সময় নেই। কেউ নিজের বন্ধুর সঙ্গে ব্যস্ত, কেউ প্রেমিকার সঙ্গে। কেউ কেউ ভারতীয় রাজনীতির সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ আবার বিশ্বরাজনীতির প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত।

সেইজন্য জে এন ইউ-কে ইউরোপের মিনি সংস্করণ বলা যেতেই পারে। বিশেষ করে এখানে ক্যাম্পাসের মধ্যে মেয়েরা যে রকম স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, তাতে পুলকের কখনও মনে হয়নি যে তারা কোন দিক থেকে পিছিয়ে আছে। এই ক্যাম্পাসের প্রত্যেক বিদ্যার্থীই নিজের নিজের মতো করে স্বাধীনতা উপভোগ

করে। কোন মেয়ে কোন ছেলের সঙ্গে কিংবা কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে কী সম্পর্ক, কিভাবে চলাফেরা করছে তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিংবা কারোরই কোন মাথাব্যথা নেই। এ সব দেখা তাদের দায়িত্ব বা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কিন্তু নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী পরীক্ষার জন্য তৈরি হতেই হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা সুনিশ্চিতভাবে জানে কোন সেমিস্টারের রেজাল্ট খারাপ হলে তাকে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যথেষ্ট নির্মম ও কঠোর।

সেইজন্য শিক্ষার্থীরা যতই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করুক না কেন পড়াশোনার ব্যাপারে তাদের সতর্ক থাকতেই হয়। আর তাই ভারতের যে কোন প্রান্তের বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় জে এন ইউ-এর শিক্ষার্থীদের অবস্থান আলাদা। তাই সবাই এদের সম্মানের চোখে দেখে ও ভালবাসে। ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর পণ্ডিত পিতার নামাঙ্কিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা দেখে গিয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যত স্কলার বেরিয়েছে, ভারতের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এত কম সময়ে এত স্কলার জন্ম নেয়নি।

পুলক একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসল। রাস্তায় দু জন আইসক্রিমওয়ালা আইসক্রিম বিক্রি করছিল। পুলকের আইসক্রিম খাবার ইচ্ছা হল। মুমুর আইসক্রিম খুব পছন্দ ছিল। বাদামওয়ালা আইসক্রিম। কিন্তু আজ তো মানিব্যাগ সঙ্গে নিয়ে সে বেরোয়নি। হাতে মাত্র একটা দশ টাকার নোট নিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু যে আইসক্রিম সে খেতে চেয়েছিল তার দাম পঁয়ত্রিশ টাকা। মুমুর কথা মনে হতেই সে একটা আইসক্রিম কিনে ফেলল, বাকিতে। গঙ্গা ধাবার এখানে সব দোকানদারেরাই এই রকম। ওদের কাছে নগদ-বাকি বলে আলাদা কোন কথা নেই। গঙ্গা ধাবার দোকানদারদের

পয়সা মেরেছে এমন কোন ছাত্র ছাত্রী জে এন ইউ-তে নেই। এমন ঘটনা নিতান্তই বিরল। পুলক আইসক্রিম হাতে নিয়ে যেইমাত্র দাঁতে ঠেকিয়েছে তখনই, অকস্মাৎ সকালের সেই লোকটির সঙ্গে মুখোমুখি, যাকে দেখে সে আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিল। তাকে সামনে দেখে তার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুমুর পছন্দের আইসক্রিম খেতে গিয়ে, আচমকা মুমুর বড় ভাই, জয়ন্ত চ্যাটার্জী তার সামনে এসে পড়বেন সেটা সে কল্পনাও করেনি।

জয়ন্তবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়ান। "ভারত-বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে"র সেমিনারে যোগ দিতেই উনি ভারতে এসেছেন। পুলকের "পি এইচ ডি" থিসিসটাও সেই বিষয়েই—বাংলাদেশ আর ভারতের প্রাইভেটাইজেশন। মুমুর কথা চিন্তা করেই সে বাংলাদেশ বেছে নিয়েছিল। সেমিনারে জয়ন্তবাবুর ভাষণ শুনেই পুলক তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। আজ সকালবেলা পরিচয় হতেই সে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। পুলক যখন কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ত তখন মুমু নামের একটি মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সে মেয়েটি বাংলাদেশ থেকে এখানে পড়তে এসেছিল। তার কোন আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে সে পড়াশোনা করত। ছুটিতে সে ঢাকায় ফিরে যেত।

বিরানব্বই সালে ধর্মের নামে কিছু ধর্মব্যবসায়ীর প্ররোচনায় অযোধ্যায় যখন বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়, তখন বাংলাদেশেও মৌলবাদীরা প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে। সেই সময় বাংলাদেশে অসংখ্য হিন্দু পরিবার মুসলিম মৌলবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত, লুণ্ঠিত ও ধর্ষিত হয়। তারা একদিন মুমুকেও তার মা-বাবার সামনে থেকেই তুলে নিয়ে যায়। মুমুর পরিবার আজও তাদের মেয়ের কোন সন্ধান পায়নি। ওর কথা মনে হলে আজও পুলকের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে

আসে। মুমুর সঙ্গে ওর পরিচয় নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই হয়েছিল। সে তখন স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ত আর মুমু বেথুনে। কোন এক বিয়েবাড়িতে দু জনের পরিচয়। তারপর থেকেই দুজনের সম্পর্ক গভীরতর হয়ে ওঠে। মুমুর আদরের চিহ্ন পুলক আজও মুছে যেতে দেয়নি। অনন্যার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ঠিকই কিন্তু তা শুধুই বন্ধুত্ব, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। পুলক নিজের কথা প্রায় শেষ করে ফেলেছিল এমন সময় ওর নজর হঠাৎ জয়ন্ত চ্যাটার্জীর ওপর গিয়ে পড়ে। যে মানুষটি কয়েক ঘণ্টা আগেও সেমিনারে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সেই মানুষটি হঠাৎ যেন চুপসে গেলেন। সে-ই আবার এখন হঠাৎ জয়ন্ত চ্যাটার্জীর ওপর গিয়ে পড়ে। সে-ই আবার এখন হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মুমু যে ওর ছোট বোন ছিল, পুলক সেটা জানত না। বিরানব্বই সালে মৌলবাদীরা যখন মুমুকে তুলে নিয়ে যায় তখন জয়ন্তবাবু ঢাকায় ছিলেন না। উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, ঢাকায় থাকলেই বা তিনি কী করতে পারতেন! সেই সময় অনেক ভাইয়েরাই তো তাদের বোনেদের সম্মান বাঁচাতে পারেনি। জয়ন্ত কি পারত তার বোনকে রক্ষা করতে?

কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার সালাম আজাদের জন্ম ২৬শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই ১৯৬৪ সালে বিক্রমপুরের দামলা গ্রামে। স্যার জে. সি. বোস ইনস্টিটিউশনের কৃতী ছাত্র সালাম আজাদের পরবর্তী শিক্ষা জীবন কেটেছে গাইবান্ধা সরকারি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। সালাম আজাদের বিভিন্ন বই ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি, অসমিয়া, মারাঠি, পাঞ্জাবি, মালয়ালাম, তামিল, গুজরাট প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সালাম আজাদ বিবাহিত। স্ত্রী মির্জা ফাহ্‌মিদাআজিম সহেলী।